



66व

४२

३०४०२

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या

66ब

१८

आगत संख्या

30805

पुस्तक—वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

Appro
Tex

669
92

पुस्तकालय

Appro
Tel

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या. **६६व**
९८

आगत संख्या .. **३०४०६**

पुस्तक— वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा ।

३० जून

20/6/91

श्रीविभूतिभूषण चट्टोपाध्याय

अर्पित ।

द्वितीय संस्करण

TEXT BOOK PUBLISHING COMPANY

49-1, Bechu Chatterjee Street, गुरुकुल, ता.

६६व

९८

गुरुकुल, आना ।

गुरुकुल, आना

Appr
Te

पुस्तकालय

Appro
Tex

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या. **६६व**
१२

आगत संख्या .. **३०४०६**

पुस्तक— वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा ।

३० जून

20.6.91

ब्रिजभूतिश्रवण चट्टोपाध्याय

अर्णीत ।

द्वितीय संस्करण

TEXT BOOK PUBLISHING COMPANY

49-1, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

६६व
१२

गु. १२/० आना ।

Appr
Te

Approved by

Text Book for Class IV of H. E., M. E. & M. V.

Schools & Madrasahs of Burdwan, Presidency,
Dacca, Rajshahi & Chittagong Divisions.

(Vide Calcutta Gazette, November 17, 1938.)

ছোটদের বিজ্ঞান

(৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

৩০ সদন

২০/৬/৩১

ত্রিবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

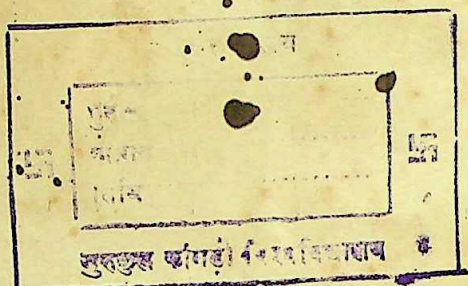
TEXT-BOOK PUBLISHING COMPANY

49-1, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

৬৬৫
৭২

মূল্য ১০/০ আনা।
মূল্য ১৫/০ আনা

Published by the Author
TEXT-BOOK PUBLISHING COMPANY
49-1, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.



কলিকাতা এজেন্ট—বিজ্ঞানদয় লাইব্রেরী,
২৫১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ঢাকা এজেন্ট—ইণ্ডিয়ান বুক সোসাইটি এবং
আসাম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা।

Printed by—Dinataran Mukherjee
Jnanodaya Press
49-1, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

गुरुकुल का संग्रहीत
सूचीपत्र

विषय	पृष्ठा
गाछेर कथा	५—१
बीजेर कथा	८—१०
मूलेर कथा	१४—१२
काण्डेर कथा	२०—३४
पातार कथा	२५—३४
फूलेर कथा	३५—४२
फलेर कथा	४३—४९
आलोकेर सहित गाछपालार सम्बद्ध ...	४८—४२
गाछपाला चिनिवार प्रणाली ...	५०—५२
प्रकृति-पञ्जिका	—५३
बग्य फूल संग्रह	—५४
क्रीट-पतङ्ग	५५—५८
पिपीलिका	५९—६४
मधुमक्षिका	६५—६९
मशा	७०—७६
माकड़सा	७७—८०
छड्डुई	८१—८२
काक	—८५
वेणु	८६—९१
प्रजापति	९२—९५

ओ३म्

पुस्तक संख्या.....

पञ्चिका संख्या.....

66 8
92
30805

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना
वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक
पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक
रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

ছোটদের বিজ্ঞান

গাছের কথা

যাহাদের জীবন আছে, তাহাদিগকে জীব বলে। মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতির জীবন আছে বলিয়া ইহাদিগকে জীব বলে। ইহারা আহার করে, ক্রমে ক্রমে বড় হয়, সম্ভান উৎপাদন করে এবং শেষে মরিয়া যায়। এই সব হইতে আমরা ইহাদের জীবনের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। আবার গাছপালাও ক্রমে বড় হয়, ফল দেয় এবং ইহাদেরও বীজ হইতে চরাগাছ জন্মে ও শেষে ইহারাও মরিয়া যায়। কাজেই, ইহাদেরও জীবন আছে। তবে মানুষ, গরু প্রভৃতি ও গাছপালা একই রকমের জীব নহে। সেজন্য জীবকে দুই

শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতিকে প্রাণী বলে। আর গাছপালাদের বলে উদ্ভিদ।

পৃথিবীতে প্রায় দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার রকমের ভিন্ন ভিন্ন গাছ আছে। প্রাণীদের দেহে যে রূপ হাত, পা, মাথা, মুখ ইত্যাদি আছে, গাছপালার দেহেও সেইরূপ বিভিন্ন অংশ আছে। প্রথমেই আমরা দেখিব, গাছপালার দেহের বিভিন্ন অংশ কি কি? তৎপর, কিরূপে গাছপালার জন্ম ও বৃদ্ধি হয়, কিরূপে উহাদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি হয় এবং গাছপালার কোন্ অংশের কি কাজ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আমরা ক্রমে ক্রমে করিব।

গাছের দেহের বিভিন্ন অংশ :

আমাদের শরীরে যেমন মাথা, ষড়্, হাত, পা প্রভৃতি কতকগুলি অংশ আছে, গাছপালার শরীরেও সেইরূপ মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি কতকগুলি অংশ আছে। একটি তেঁতুলের চারা মাটি হইতে উঠাইয়া দেখ, উহার এক অংশ মাটির নিচে এবং এক অংশ মাটির উপরে থাকে।

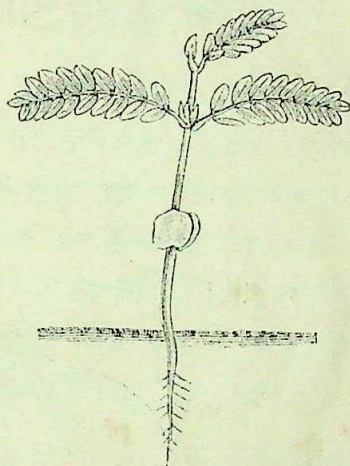
মূল, কাণ্ড ও পাতা :

পরপর চিত্রে দেখ, গাছের যে অংশ মাটির নিচে থাকে, উহাকে মূল বলে। আর যে অংশ মাটির উপরে

গাছের কথা

৭

থাকে, উহাকে কাণ্ড বলে। আরও দেখ, কাণ্ডের গায়ে পাতা সাজান রহিয়াছে।



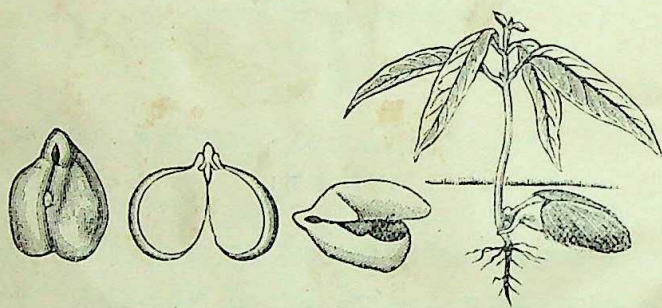
তেঁতুলি চারা।

এ চারাগাছ বাড়িয়া ক্রমে বড় গাছে পরিণত হয়। গাছ বড় হইলে উহাতে ফুল ধরে এবং ঐ ফুল হইতে ফল হয়; আর ফলের ভিতর বীজ থাকে। ঐ বীজ হইতে আবার চারাগাছ জন্মে।

বীজের কথা

বীজপত্র :

কয়েকটি ছোলাকে একরাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখ। পরদিন সকালে একটি ভিজান ছোলা লইয়া উহার উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেল। এখন দেখ, ভিতরে দুইখণ্ড ডাইল রহিয়াছে। ঐ দুইটি খণ্ডকে বীজের পাতা বা বীজপত্র বলে। বীজ হইতে



ভিজান ছোলা। ছোলার বীজপত্র। ছোলার খোসা। আনচার।

যে চারা বাহির হয়, উহার গায়ে বা কাণ্ডে প্রথমে যে দুইটি মোটা পাতা দেখা যায়, উহাই বীজের ভিতরকার সেই বীজপত্র। ৭ম পৃষ্ঠার চিত্রে তেঁতুলের চারার গায়ে বীজপত্র দুইটি দেখ। শিম, লাউ, কুমড়া, আম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের বীজেও দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে। কিন্তু আম প্রভৃতি

বীজের কথা

৯

গাছের বীজের বীজপত্র দুইটি মাটির নিচে থাকে; উহা তেঁতুল, শিম প্রভৃতি গাছের বীজের বীজপত্রের মত কাণ্ডের সহিত মাটির উপরে উঠে না।

যে সব গাছের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে দ্বি-বীজপত্রী গাছ বলে।

আবার ধান, ভুট্টা, যব, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছের বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে। সেইজন্য ইহাদিগকে এক-বীজপত্রী গাছ বলে।

যে সব গাছের বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে এক-বীজপত্রী গাছ বলে।

এখন আমরা দেখিলাম, যে সব গাছপালার বীজ হয়, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—১। এক-বীজপত্রী, ২। দ্বি-বীজপত্রী।

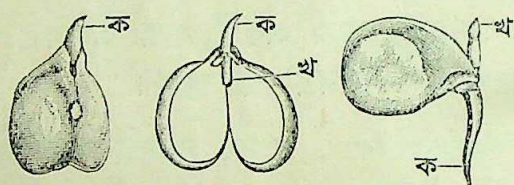
বীজ-মধ্যে শিশু-উদ্ভিদের আনন্দ

আর একটি ভিজান ছোঁলার খোসা সাবধানে ছাড়াইয়া ফেল। সামান্য চাপ দিলে বীজপত্র দুইটি একটু ফাঁক হইয়া যাইবে। এখন দেখ, বীজপত্র দুইটির এক জায়গায় সামান্য জোড়া আছে এবং ঐ জোড়ের মুখে সূতার মত একটি ছোট বক্র জিনিস লাগিয়া আছে, উহাই বীজের ভিতরকার শিশু-উদ্ভিদ; উহা বাড়িয়া ক্রমে চারাগাছে পরিণত হয়।

শিশু-মূল ও শিশু-কাণ্ড :

এক্ষণে দেখ, ঐ শিশু-উদ্ভিদটির এক প্রান্ত বাহিরে এবং অপর প্রান্ত ভিতরে রহিয়াছে। বাহিরের প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত সরু, উহাকে শিশু-মূল বলে; উহা বাড়িয়া ক্রমে মাটির ভিতর প্রবেশ করে।

শিশু-উদ্ভিদটির ভিতরের প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা, উহাকে শিশু-কাণ্ড বলে; উহা ক্রমে মাটির উপর দিকে বাড়িয়া উঠে।



ক। শিশু-মূল। খ। শিশু-কাণ্ড।

এইরূপে শিশু-উদ্ভিদের শিশু-মূল বাড়িয়া মূলে এবং শিশু-কাণ্ড বাড়িয়া কাণ্ডে পরিণত হইয়া ক্রমে পাতাযুক্ত চারাগাছ হয়। চারা একটু বড় হইলে বীজপত্র দুইটি খসিয়া পড়ে।

আমরা এ পর্যন্ত দেখিলাম বীজের দুইটি অংশ,—১। বীজের খোসা, ২। শিশু-উদ্ভিদ। শিশু-উদ্ভিদটির আবার তিনটি অংশ আছে,—১। বীজপত্র, ২। শিশু-মূল, ৩। শিশু-কাণ্ড।

শিম, মটর, মুগ, মসুর প্রভৃতির বীজও ঠিক ছোলায় বীজের মত। উহাদেরও খোসার ভিতর শিশু-উদ্ভিদ থাকে।

বীজের কথা

১১

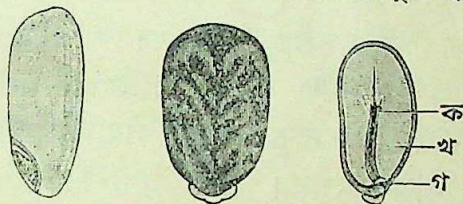
শ্রাবু

এবং
ভাগ
ড়িয়া

এক প্রকারের বীজ আছে, যাহার খোসার ভিতর
শিশু-উদ্ভিদ ছাড়াও ধাতু নামে আর এক রকম জিনিস থাকে।
এই প্রকার বীজের বীজপত্র বেশি পুরু হয় না।

মাটা,
দিকে

একটা ভিজান ধান লও। উহার তুষ ছাড়াইয়া ফেলিলে
খুব পাতলা খোসা সমেত একটি সাদা চাউল বাহির হইল;
উহাই ধানের বীজ। চাউলটার এক কোণের কিছুটা স্থান চক্চকে



চেরা-চাউল, রেড়ির বীজ, চেরা-রেড়ি।

ক। বীজপত্র, খ। ধাতু, গ। শিশু-মূল ও শিশু-কাণ্ড।

শিশু-
গাছ
জের

এবং এখানে দেখ, উহার শিশু-উদ্ভিদ রহিয়াছে। শিশু-
উদ্ভিদ ছাড়া চাউলের সমস্ত সাদা অংশই ধাতু। শিশু-উদ্ভিদ
যেখানে ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এখানে দেখ, পাতলা
পর্দার মত একটি মাত্র বীজপত্র আছে।

অংশ
।

হালার

একটি রেড়ির বীজ সাবধানে দুইভাগে চিরিয়া দেখ,-
উহার ভিতর একটা সাদা জিনিসের মাঝখানে শিশু-উদ্ভিদ
রহিয়াছে। শিশু-উদ্ভিদ ছাড়া বাকি সমস্ত সাদা অংশ ধাতু।
রেড়ির বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, বীজ দুই প্রকার ; যথা,—

১। ধাতুযুক্ত বীজ, ২। ধাতুশূন্য বীজ।

চাউল, গম, রেড়ি, তালশাঁস প্রভৃতি ধাতুযুক্ত বীজ এবং ছোলা, মটর, শিম প্রভৃতি ধাতুশূন্য বীজ।

শিশু-উদ্ভিদের খাদ্য :

গাছপালারও বড় হইবার ও বাঁচিবার জন্য খাওয়ার আবশ্যক হয়। এখন দেখিতে হইবে, শিশু-উদ্ভিদ কি খাইয়া বড় হয় ও বাঁচিয়া থাকে এবং কোথা হইতেই বা ইহার আহার পায়। পূর্বে যে বীজপত্র ও ধাতুর কথা বলিয়াছি, উহাই শিশু-উদ্ভিদের খাদ্য-ভাণ্ডার। উহার মধ্যে শিশু-উদ্ভিদের খাদ্য কঠিন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। শুধু শিশু-উদ্ভিদ কেন, ছোট চারাগাছ এবং বড় গাছপালারও তরল ভিন্ন কঠিন খাদ্য খাইতে পারে না। জল, উত্তাপ এবং বায়ুর সাহায্যে বীজপত্রে এবং ধাতুতে সঞ্চিত কঠিন খাদ্য তরল হয় এবং ঐ তরল খাদ্য খাইয়াই শিশু-উদ্ভিদ বড় হয় ও বাঁচিয়া থাকে।

জল, উত্তাপ এবং বায়ুর আবশ্যকতা :

বীজ কলাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জল, উত্তাপ এবং বায়ু আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে কোন একটির অভাব হইলে বীজ হইতে কল বাহির হয় না। জল বা

বীজের কথা

১৩

উতাপ অতিরিক্ত হইলে বীজের ভিতরকার শিশু-উদ্ভিদ মরিয়া যায়। বরফের মত অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়ও বীজ কলায় না। যে মাটির ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, এমন মাটিতে বীজ পুঁতিলে বায়ুর অভাবে বীজ কলায় না। আবার অতিরিক্ত আলোকও বীজ কলাইবার ব্যাঘাত ঘটায়। এই সব কারণেই কৃষকেরা মাটি ভালরূপে চষিয়া খুঁড়িয়া পরে তাহাতে বীজ বুনিয়া বীজগুলিকে মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেয়। এইরূপ মাটিতে জল, উতাপ ও বায়ুর সাহায্যে ধাতুযুক্ত বীজের ধাতুস্থ এবং ধাতুশূন্য বীজের বীজপত্রস্থ কঠিন খাণ্ড তরল হয় এবং ঐ তরল খাণ্ড খাইয়া শিশু-উদ্ভিদ বর্দ্ধিত হয়।

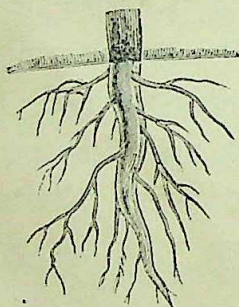
পরীক্ষা।—তোমরা একটা টবে কিছু গুঁড়া মাটি লইয়া তাহার উপর কয়েকটি ছোলা অল্প জল দিয়া ভিজাইয়া রাখ। দুই এক দিন পরে দেখিবে, বীজের খোসা ভেদ করিয়া সাদা সাদা কল বা শিশু-উদ্ভিদের শিশু-মূল বাহির হইয়াছে। আর দুই এক দিন পরে দেখিবে, শিশু-মূল বাড়িয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করিতেছে ও শিশু-কাণ্ড উপর দিকে বাড়িয়া উঠিতেছে। আর দুই তিন দিন পরে দেখিবে, মূল এবং কাণ্ড বাড়িয়া কচি পাতাযুক্ত চারাগাছ হইয়াছে।

মূলের কথা

শিশু-উদ্ভিদের শিশু-মূল বাড়িয়া যে মূল হয়, উহাই উদ্ভিদের আসল বা মূল শিকড়। উহা মাটির ভিতর ঢুকিয়া যায়। এই আসল শিকড় দুই প্রকার; যথা,—১। মূল-শিকড় (প্রধান শিকড়), ২। গোছা-শিকড়।

মূল-শিকড় :

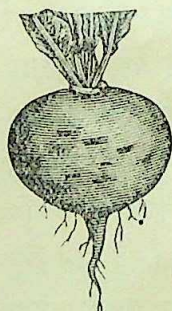
প্রথমে গাছের একটি মোটা শিকড় ক্রমে সরু হইয়া মাটির ভিতরদিকে চলিয়া যায়। এই শিকড়কে মূল-শিকড় বা প্রধান শিকড় বলে। সচরাচর দ্বি-বীজপত্রী গাছেরই



মূল-শিকড়।



মূল।



শালগম।

এইরূপ মূল-শিকড় হয়। ক্রমে ঐ শিকড়ের গা হইতে অনেক সরু সরু শিকড় বাহির হইয়া মাটির ভিতর ছড়াইয়া

মূলের কথা

১৫

যায়। আম, কাঁটাল, জাম, তেঁতুল, অশ্বথ প্রভৃতি গাছ যত বড় হইতে থাকে, উহাদের মূল-শিকড় এবং শাখা-শিকড় তত মোটা ও লম্বা হইয়া মাটির ভিতর অনেক দূর ছড়াইয়া যায়। যে সব গাছ অনেক দিনের, তাহাদের কোন্টি মূল-শিকড় এবং কোন্টি শাখা-শিকড় তাহা অনেক সময় চেনাই যায় না। মূলা, গাজর, শালগম প্রভৃতির মাটির নিচের যে অংশ আমরা খাই, উহা তাহাদের মূল-শিকড়। এই মূল-শিকড়ের গায়ে ছোট ছোট শাখা-শিকড় থাকে।

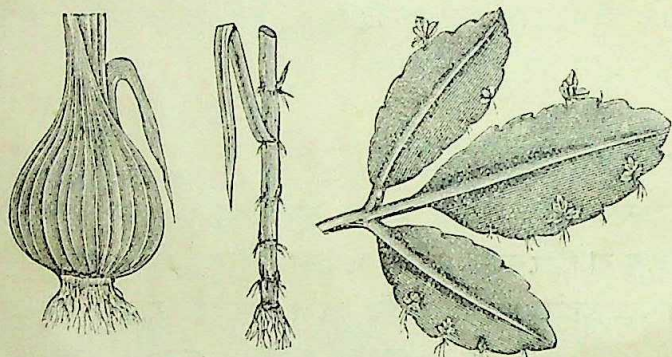
গোছা-শিকড় :

কতকগুলি গাছের আবার মূল-শিকড় (প্রধান শিকড়) থাকে না। কেবল গাছের গোড়া হইতে এক গোছা সরু শিকড় বাহির হইয়া মাটির মধ্যে ছড়াইয়া যায়। এইজন্য এইরূপ শিকড়কে গোছা-শিকড় বলে। সচরাচর এক-বীজপত্রী গাছেরই এইরূপ গোছা-শিকড় হয়। ধান, পেঁয়াজ, গম, ভুট্টা, যব, শতমূলী, আখ, বাঁশ, সুপারি, নারিকেল, খেজুর, তাল প্রভৃতি অনেক গাছেরই গোছা-শিকড় হয়।

আকস্মিক শিকড় :

মূল-শিকড় এবং গোছা-শিকড় ছাড়া অন্য রকম শিকড়ও আছে। সে সব শিকড় গাছের কাণ্ড এবং পাতা হইতে

বাহির হয়। এই প্রকার শিকড়কে আকস্মিক শিকড় বলে।
দূর্বা, পটোল, কুমড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের গাঁইট হইতে
শিকড় বাহির হয়। আবার আখ, বাঁশ, জবা, গোলাপ,
মল্লিকা, টগর প্রভৃতি গাছের কাণ্ড ভিজা মাটিতে পুঁতিয়া
রাখিয়া দেখিও, উহাদের মাটির নিচের গাঁইট হইতে শিকড়
বাহির হয়।



পেঁয়াজ—গোছা-শিকড়।	আখ—গোছা-শিকড়	পাথরকুচির পাতা—
	ও বায়ব-শিকড়।	আকস্মিক শিকড়।

পাথরকুচি এবং পাতাবাহার গাছের পাতা মাটি চাপা
দিয়া রাখিলেও, উহা হইতে শিকড় বাহির হয়।

বায়ব শিকড় :

যে সব শিকড়ের মাটির সঙ্গে কোন সংযোগ থাকে না,
মাটির উপর বায়ুতে বাড়ে, তাহাদিগকে বায়ব শিকড় বলে।

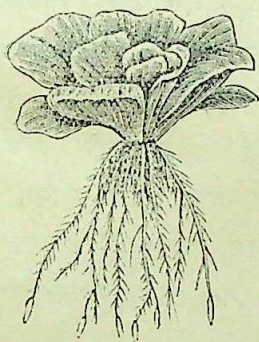
মূলের কথা

১৭

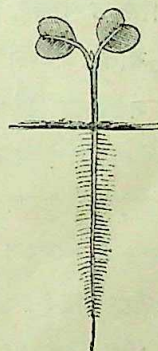
অবশ্য মাটি পাইলে ইহারা মাটির ভিতরেও প্রবেশ করে। যেমন, বটগাছের কাণ্ড বা ডাল হইতে নামিয়া-আসা ঝুরি, আখ, বাঁশ, ভুট্টা প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের গাঁইটের চারি পাশের শিকড়, আলোকলতার শিকড় ইত্যাদি। এই প্রকারের শিকড় বায়ুতেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ব পৃষ্ঠায় আখের কাণ্ডের গাঁইটে বায়ব শিকড় দেখ।

মূলত্রাণ ও লোম-শিকড় :

শিকড়ের কচি ডগা বা বাড়ন্ত অগ্রভাগ খুব নরম ও সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ বাড়ন্ত অগ্রভাগের শেষপ্রান্ত টুপির



টোপা পানা।



সরিসা গাছ।

মত একটা জিনিসে ঢাকা থাকে, উহাকে মূলত্রাণ বলে। তোমরা বট গাছের ঝুরি এবং টোপা পানার শিকড়ের অগ্রভাগে

ইহা পরিস্কাররূপে দেখিতে পাইবে। মূলত্রাণের ঠিক উপরের অংশে সরু শিকড়ের গায়ে কতকটা দূর পর্য্যন্ত লোমের মত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় থাকে, উহাদিগকে লোম-শিকড় বলে। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে মূলত্রাণ ও লোম-শিকড় দেখ।

শিকড়ের কাজ :

১। গাছ যাহাতে মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে এবং বড় বাতাসেও সহজে উপড়াইয়া না যায়, সেজন্য শিকড়েরা সকলে মিলিয়া জোরে শক্ত করিয়া মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। গাছ উপর দিকে যতই বাড়িতে থাকে, উহার শিকড়গুলিও ততই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া মোটা ও লম্বা হইয়া অধিক মাটি আঁকড়াইয়া ধরে। লতানে গাছও যাহাতে সহজে উপড়াইয়া না যায়, সেজন্য ইহার শিকড়েরা যথাসক্তি জোরে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। জলের উপর ভাসমান টোপা পানা, কচুরি পানা প্রভৃতি গাছের শিকড়গুলিও জলের নিচে একরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া থাকে যে, গাছ বাতাসের বেগে সহজে উল্টাইয়া যায় না।

২। খাদ্য সংগ্রহ করা শিকড়ের প্রধান কাজ। তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ, শিশু-উদ্ভিদ বীজপত্র এবং বীজস্থ ধাতু হইতেই খাবার পায়। এক্ষণে আমরা দেখিব, গাছ বড় হইলে উহার শিকড় কিরূপে মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

মূলের কথা

১৯

শিকড়ের খাদ্য-সংগ্রহ :

গাছের অনেক খাটাই মাটির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। শিকড়ের যে অংশ লোম-শিকড়ে আবৃত, সেই অংশ লোম-শিকড় দ্বারা মাটি হইতে রস টানিয়া লয়। ঐ রসে জলের ভাগই বেশি এবং উহার মধ্যে গাছের খাট তরল অবস্থায় থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, শিশু-উদ্ভিদ, চারাগাছ, এমন কি বড় বড় গাছ পর্যন্ত জলের মত তরল খাট ছাড়া কঠিন খাট খাইতে পারে না। কাজেই, গাছের যে সব খাট সহজে জলে গলিয়া যায়, তাহা জলের সহিত শিকড় টানিয়া লয়। আর যে সব খাট জলে সহজে গলে না, শিকড় হইতে এক প্রকার অল্পরস বাহির হইয়া তাহা গলাইয়া জলের সহিত মিশাইয়া লয় এবং তারপর লোম-শিকড় উহা টানিয়া লয়। এইরূপে শিকড় মাটি হইতে খাট সংগ্রহ করিয়া উহা কাণ্ডে পৌঁছাইয়া দেয় এবং কাণ্ড আবার ঐ রস পাতায় পৌঁছাইয়া দেয়।

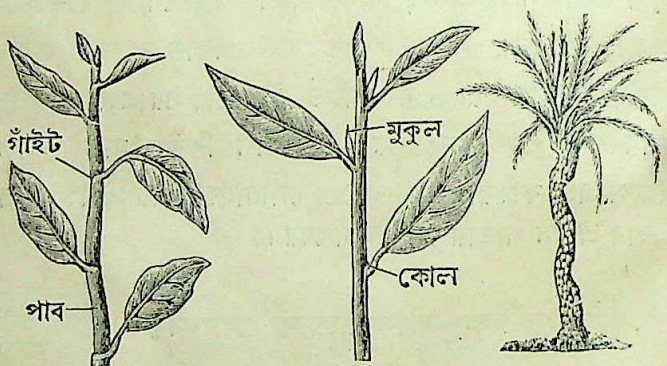
শিকড় আঁকা-বাঁকা হয় কেন ?

শিকড় জল ও খাট সংগ্রহের জন্য মাটির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে যদি কোনও শক্ত জিনিসের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তবে শিকড় সেখান হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য পথে চলিয়া যায়। এইজন্য শিকড় আঁকা-বাঁকা হয়।

কাণ্ডের কথা

গাঁইট, পাব, কোল ও মুকুল।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শিশু-উদ্ভিদের শিশু-কাণ্ড হইতে কাণ্ড হয় এবং কাণ্ডের গায়ে পাতা সাজান থাকে। কাণ্ডের যে স্থান হইতে পাতা বাহির হয়, উহাকে গাঁইট বলে। দুই গাঁইটের মাঝখানের অংশকে পাব বলে। আর যে স্থানে পাতা কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, উহাকে পাতার কোল



গাঁইট ও পাব।

কোল ও মুকুল।

খেজুর গাছ।

বলে। পাতার কোলে মুকুল বা কুঁড়ি হয়। কাণ্ডের গায়ের এই মুকুল বাড়িয়া নূতন ডালপালায় পরিণত হয়। পাতার কোল হইতে ফুলও বাহির হয়। কাণ্ডের কটি অগ্রভাগের শেষপ্রান্তে আর একটি মুকুল থাকে, উহা কটি

কাণ্ডের কথা

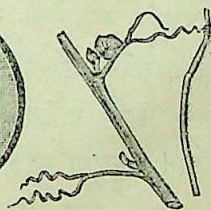
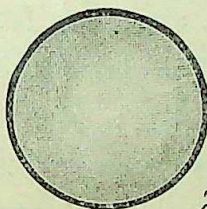
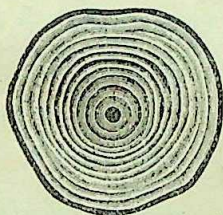
২১

পাতার গোড়ায় ঢাকা থাকে এবং মাথার এই মুকুল বাড়িলে কাণ্ড দীর্ঘ হয়। আম, কাঁটাল, অশ্বথ ইত্যাদি গাছ এই শ্রেণীভুক্ত। আর যে সব গাছের কাণ্ডের গায়ের মুকুল বাড়ে না, তাহাদের ডালপালা হয় না; যেমন নারিকেল, সুপারি, তাল ইত্যাদি গাছ। ইহাদের কেবল কাণ্ডের মাথার মুকুল বাড়িয়া কাণ্ড দীর্ঘ হয়।

গুঁড়ি :

৬৬৪
৭২

বড় বড় গাছের কাণ্ডকে চলিত কথায় গুঁড়ি বলে। ইহার মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; যেমন আম, কাঁটাল, জাম, তাল, সুপারি, নারিকেল, বাঁশ ইত্যাদি



আমের কাণ্ড।

তালের কাণ্ড।

কুমড়া গাছের কাণ্ড।

গাছের গুঁড়ি। আম, কাঁটাল প্রভৃতি অনেক গাছের গুঁড়ির বাহিরের দিকের কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম ও ভিতরের দিকের কাঠ শক্ত। আর তাল, সুপারি, বাঁশ প্রভৃতি গাছের গুঁড়ির বাহিরের দিকের কাঠ শক্ত ও ভিতরের দিকের অংশ নরম, আঁশযুক্ত এবং অল্পাধিক ফাঁপা।

ডাঁটা :

লতানে গাছের কাণ্ডকে চলিত কথায় ডাঁটা বলে। ইহাদের কাণ্ড বা ডাঁটা সরু ও অত্যন্ত দুর্বল। সেজন্য ইহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না ; যেমন—দুর্বা, আমরুল, লাউ, কুমড়া, শসা, শিম, পুঁই প্রভৃতি গাছের ডাঁটা। দুর্বা, আমরুল প্রভৃতি গাছের কাণ্ড বা ডাঁটার গায়ের গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া যায় ও মাটি জড়াইয়া ধরে। ইহাদের কাণ্ড বা ডাঁটা মাটির উপর লতাইয়া যায়। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গাছ কাণ্ড বা ডাঁটার গাঁইট হইতে আঁকুড়ি বাহির করিয়া তদ্বারা অণু আশ্রয়কে জড়াইয়া ধরিয়া উপর দিকে বাড়িয়া যায়। শিম, পুঁই প্রভৃতি গাছের কাণ্ড বা ডাঁটা অণু আশ্রয়ের গায়ে জড়াইয়া উপর দিকে বাড়িয়া উঠে। শিয়ালকাঁটা, বেত প্রভৃতি গাছ কাঁটার সাহায্যে আশ্রয়কে জড়াইয়া ধরে।

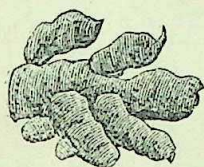
আম, জাম, তাল প্রভৃতি গাছের কাণ্ড গোলাকার। ফনিমনসা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড চেপ্টা। বেল, বাবলা, শিমুল, ফনিমনসা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড কণ্টকযুক্ত। মুখা প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে তিনটি শিরা থাকে। বাবুই তুলসী প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে চারিটি শিরা থাকে। তোমরা লক্ষ্য করিলে, আরও নানা আকারের কাণ্ড দেখিতে পাইবে।

কাণ্ডের কথা

২৩

মাটির ভিতরের কাণ্ড :

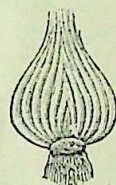
আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, গোলআলু, ওল, কচু ইত্যাদি মাটির নিচের কাণ্ড। উহারা মূল নহে। কারণ, আমরা আদা, হলুদ, গোলআলু প্রভৃতির গায়ে যে পাতলা কাগজের মত খোসা দেখিতে পাই, উহাই উহাদের পাতার বিকৃত



আদা।



গোল আলু।



চেরা-পেঁয়াজ।

অবস্থা এবং উহাদের গায়ের গাঁইট হইতেও মুকুল বাহির হয়। পেঁয়াজের গায়ের আবরণ বা পর্দাগুলিই উহার পাতা। একটা পেঁয়াজকে দুইভাগে চিরিয়া দেখ, উহার ভিতর একটা মুকুলও রহিয়াছে।

মনে রাখিও—মূলা, গাজর, শালগম, রাঙা আলু, শাক আলু প্রভৃতি গাছের মূল ; ইহারা কাণ্ড নহে। কারণ, কাণ্ডের মত ইহাদের গায়ে পাতা, গাঁইট, পাব এবং মুকুল থাকে না।

কাণ্ডের কাজ :

পত্রসজ্জা।—তোমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, গাছের কাণ্ড ও ডালপালাসমূহ সবুজ পাতাগুলিকে এমন কৌশলে

দেহে ধারণ করে ও আলোর দিকে তুলিয়া ধরে যে, পাতাসকল যাহাতে বেশি পরিমাণে আলো ও বাতাস পাইতে পারে। এজন্য গাঁইটে পরস্পর পাশাপাশি বা মুখোমুখিভাবে পাতা সাজান থাকে। আবার উপরের গাঁইটের পাতা উহার নিচের গাঁইটের পাতার উপর যাহাতে না পড়ে, সেজন্য উপরের গাঁইটের পাতা নিচের গাঁইটের পাতার ঠিক ফাঁকের সোজা উৎপন্ন হয়। তোমরা পত্রসজ্জায় এইরূপ নানা কৌশল দেখিতে পাইবে। মোটের পর, একটা পাতা অণুটাকে কিছুতেই আড়াল করে না। ২০শ পৃষ্ঠায় খেজুর গাছের গুঁড়ির গায়ে পুরাতন পাতার দাগগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখ। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কাণ্ডের গায়ে পাতা কিরূপ ফাঁকে ফাঁকে সাজান থাকে।

ভারবহন।—যে সমস্ত গাছ মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের কাণ্ড ডালপালা, পাতা ফুল, ফল প্রভৃতি সমেত সমস্ত গাছটিকে মাটির উপর খাড়া রাখে।

খাদ্য-সরবরাহ।—শিকড় যে খাদ্য অর্থাৎ জল ও অণু খাবার যাহা কাণ্ডে পৌঁছাইয়া দেয়, কাণ্ড আবার উহা পাতায় পৌঁছাইয়া দেয়। পাতায় খাদ্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কাণ্ডের ভিতর দিয়া গাছের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে খাদ্য কাণ্ডের দ্বারা গাছের দেহের সর্বত্র সরবরাহ হয়।

গাসকল

পারে।

পাতা

উহার

সেজন্য

কাঁকের

কৌশল

ক্ষুণ্ণ

গায়ে

হইলে

কাঁকে

হইয়া

ল, ফল

ও অন্য

পাতায়

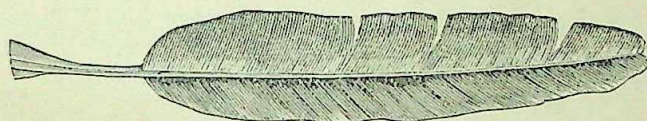
পুনরায়

পড়ে।

সর্বত্র

পাতার কথা

পাতার রঙ সাধারণতঃ সবুজ। নানা রকম গাছে নানা রকম পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন গাছের পাতা লম্বা, কোন গাছের পাতা গোলাকার, কোন গাছের পাতা ছোট, কোন গাছের পাতা বড়, কোন গাছের পাতার ধার সরল, কোন গাছের পাতার ধারে খাঁজ কাটা ইত্যাদি কত রকম পাতাই দেখা যায়। আমরা প্রথমে দেখিব, পাতার কোন্ অংশকে কি বলে।



কলাপাতা।

ফলক।—একটি কলাপাতা দেখ। কলাপাতার চওড়া ও পাতলা যে অংশের উপর আমরা ভাত রাখিয়া খাই, উহাকে ফলক বলে।

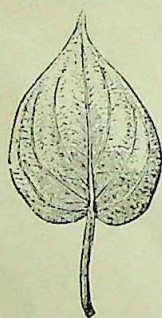
বোঁটা ও বেঁটনী।—কলাপাতার ফলকের নিচের অংশকে ডাঁটা বা বোঁটা বলে। আর বোঁটার নিচের যে অংশ গাছকে বেঁটন করিয়া থাকে, তাহাকে বেঁটনী বলে। তাল, সুপারি, নারিকেল, মানকচু প্রভৃতি গাছের পাতায় ফলক, বোঁটা ও বেঁটনী আছে। ঘাস, আখ, ধান, ভুট্টা

প্রভৃতি গাছের পাতায় বোঁটা নাই, কেবল ফলক ও বেঁটনী আছে। আবার আম, বট, জবা, পদ্ম প্রভৃতি গাছের পাতায় বেঁটনী নাই, কেবল ফলক ও বোঁটা আছে। গন্ধরাজ, রঙ্গন প্রভৃতি গাছের পাতায় বোঁটা ও বেঁটনী নাই, কেবল ফলক আছে।

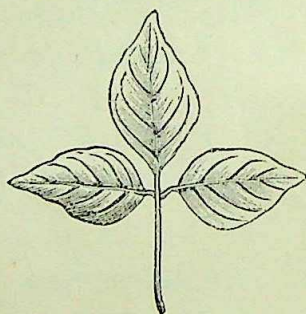
পাতার প্রকার-ভেদ :

গাছের পাতা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—
১। সরল পত্র, ২। যুক্তপত্র।

সরল পত্র।—যে সকল পাতায় একটি মাত্র ফলক থাকে, তাহাদিগকে এক-ফলক পাতা বা সরল পত্র বলে; যেমন কলা, আম, কাঁটাল, জাম, লিচু, পান প্রভৃতি গাছের পাতা।



পানপাতা।



বেলপাতা।



তেঁতুলপাতা।

যুক্তপত্র।—যে সকল পাতায় একাধিক ফলক থাকে, তাহাদিগকে বহু-ফলক পাতা বা যুক্তপত্র বলে; যেমন

পাতার কথা

২৭

বেষ্টনী
গাছের
ক্ষরাজ,
কেবল
বেল, শিমুল, আমরুল, শিম প্রভৃতি গাছের পাতা। ইহাদিগের
ফলকগুলি হাতের আঙুলের মত সাজান।

পক্ষপত্র।—যে সকল যুক্তপত্রে ফলকগুলি পাখীর পালকের
মত সাজান থাকে, তাহাদিগকে পক্ষপত্র বলে; যেমন
তৈঁতুল, বাবলা, নিম, কৃষ্ণচূড়া, সজিনা প্রভৃতি গাছের পাতা।

যথা—
পত্রক।—যুক্তপত্রের এক একটি ফলককে পত্রক বলে;
যেমন বেলপাতায় তিনটি এবং তৈঁতুল পাতায় অনেক
পত্রক থাকে।

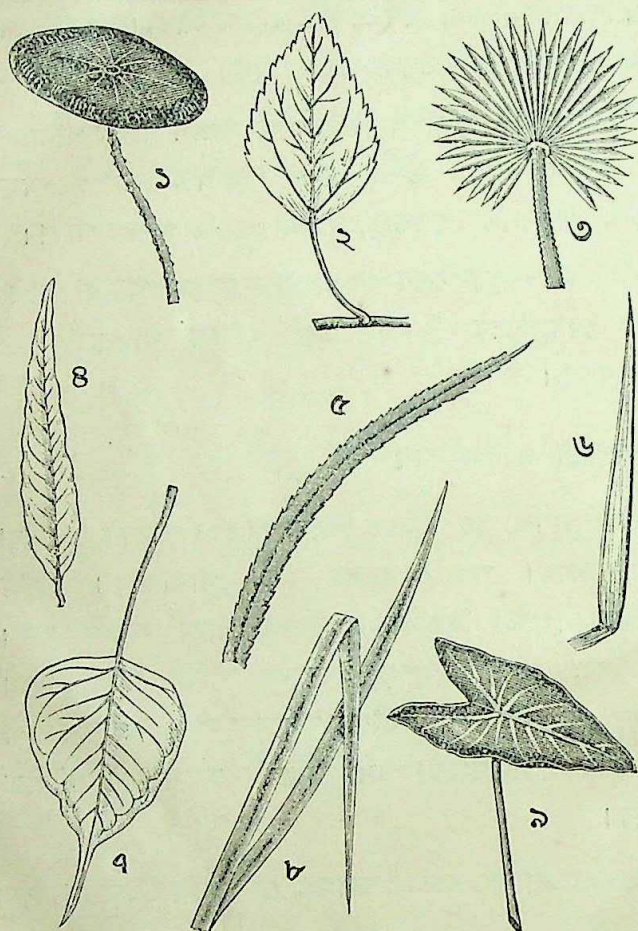
থাকে,
যেমন
তা।
পাতার আকার।



কোন্টা কি গাছ চিনিতে হইলে, পাতার আকৃতি জানিয়া
রাখা দরকার। পদ্ম ও কুলের পাতা গোলাকার। মাধবী
ও টগরের পাতা ডিম্বাকার। বাঁশের পাতা বল্লমের মত।
ধান, যব, কেশে, উলুখড় ইত্যাদির পাতা রেখার মত।
কলমি এবং কচুর পাতা তীরের ফলকের মত। এইরূপ নানা
আকারের পাতা তোমরা লক্ষ্য করিলেই আশেপাশে দেখিতে
পাইবে।

পাতার প্রান্ত, অগ্রভাগ, বোঁটা ইত্যাদি।

পপাতা।
থাকে,
যেমন
পদ্ম, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি পাতার ধার বা কিনারা
সরল; ইহাদের ধারে কোন খাঁজ নাই। জবা, গোলাপ প্রভৃতি
পাতার ধারে খাঁজ কাটা আছে। তাল, পেঁপে, তরমুজ,



- ১। পদ্ম পাতা। ২। জবা পাতা। ৩। তাল পাতা।
 ৪। দেবদারু পাতা। ৫। আনারস পাতা। ৬। খেজুর পাতা।
 ৭। অশ্বথ পাতা। ৮। ধান পাতা। ৯। কচু পাতা।

পাতার কথা

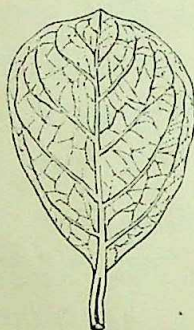
২৯

স্থলপদ্ম, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি পাতার ধারে গভীরভাবে খাঁজ কাটা। দেবদারুর পাতার ধার ঢেউ-খেলান। আনারসের পাতার ধার কাঁটায়ুক্ত। খেজুর পাতার অগ্রভাগে কাঁটা থাকে। অশ্বথের পাতার অগ্রভাগ খুব সরু ও মূঁচল। আরও দেখ, অধিকাংশ গাছের পাতার বোঁটা পাতার গোড়ার দিকে থাকে ; যেমন—আমপাতা, কাঁটালপাতা প্রভৃতির বোঁটা। কিন্তু পদ্ম পাতার বোঁটা পাতার মধ্যস্থলে সংযুক্ত। পদ্মপাতা এবং পেঁপের পাতার বোঁটা লম্বা। কিন্তু আম, কাঁটাল প্রভৃতি পাতার বোঁটা বেশি লম্বা নহে। সব গাছের পাতা আবার সমান পুরু হয় না। আম, বাঁশ, অশ্বথ প্রভৃতি গাছের পাতা বেশি পুরু হয় না। কিন্তু পাথরকুচি, মনসা, পুঁই, পালং প্রভৃতি গাছের পাতা বেশ পুরু।

পাতার শিরা :

মধ্য-শিরা, পক্ষ-শিরা ও র্যাকিস (Rachis)।—
তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, গাছের পাতায় বহু শিরা থাকে। তন্মধ্যে সরল পত্রের বোঁটার মাথা হইতে যে মোটা শিরাটি পাতার মাঝখান দিয়া পাতার অগ্রভাগ পর্যন্ত গিয়াছে, উহাকে পাতার মধ্য-শিরা বলে। পান খাইবার সময় পানের পাতার ঐ মধ্য-শিরাটি ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই মধ্য-শিরার গা হইতে বহু শাখা-শিরা বাহির হইয়া পাতার ধার পর্যন্ত পাখীর পালকের মত বিস্তৃত থাকে। সেজন্য,

ইহাদিগকে পক্ষ-শিরা বলে। আম, কাঁটাল, বট প্রভৃতি গাছের পাতায় এইরূপে শিরা সাজান থাকে। একটা কাঁটাল বা বটের পুরাতন পচা পাতা কুড়াইয়া আনিয়া দেখ, পাতার শাঁস পচিয়া যাওয়ায় শিরাগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং পাতায় কি ভাবে শিরা সাজান রহিয়াছে।



পচা কাঁটাল পাতার শিরা।



পেঁপে পাতা।

তৈতুল, বক প্রভৃতি যুক্তপত্রের মধ্য-শিরাকে র্যাকিস (Rachis) বলে। ইহার দুইধারে ছোট ছোট অনেকগুলি ফলক পালকের মত সাজান থাকে।

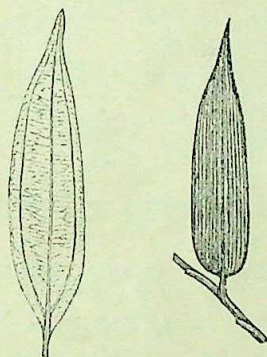
কর-শিরা।—কতকগুলি পাতার বোঁটার মাথা হইতে অনেকগুলি মোটা শিরা বাহির হইয়া হাতের আঙুলের মত ফলকে ছড়াইয়া যায় এবং ঐ সকল মোটা শিরা হইতে বহু শাখা-শিরা বাহির হইয়া শিরা-বিগ্ধাস ঠিক জালের মত দেখায়; ইহাদিগকে কর-শিরা বলে। লাউ, কুমড়া, কার্পাস, স্থলপদ্ম, পেঁপে প্রভৃতি গাছের পাতায় এইরূপে শিরা সাজান থাকে।

পাতার কথা

৩১

প্রভৃতি
কাঁটাল
পাতার
হ এবং

বক্র-শিরা।—কতকগুলি পাতার বোঁটার মাথা হইতে মোটা শিরা বাহির হইয়া পাতার ফলকে ধনুকের মত বক্রভাবে সাজান থাকে ; এইজন্য ইহাদিগকে বক্র-শিরা বলে। এই সমস্ত মোটা শিরার গা হইতে বহু শাখা-শিরা বাহির হইয়া



তেজপাতা ।

বাঁশ পাতা ।

কিস
কগুলি

পাতার ফলকের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তেজপাতা ও কুল প্রভৃতির পাতায় এইরূপে শিরা সাজান থাকে।

হইতে
র মত
তে বহু
দখায় ;
লপদ্য,
থাকে।

সমান্তরাল-শিরা।—কতকগুলি পাতার বোঁটার মাথা হইতে অনেকগুলি মোটা শিরা বাহির হইয়া সমান্তরালভাবে পাতার অগ্রভাগ পর্যন্ত যায়। ইহাদিগকে সমান্তরাল-শিরা বলে। ঘাস, বাঁশ, আখ, ভুট্টা ধান, যব প্রভৃতির পাতায় এইরূপে শিরা সাজান থাকে। অনেক এক-বীজপত্রী গাছের পাতাতে এইরূপে শিরা সাজান থাকে।

পাতার শুঁয়ো ও কাঁটা :

গাছের পাতার পিঠে খুব ছোট ছোট যে সকল লোম লাগান থাকে, তাহাদিগকে পাতার শুঁয়ো বলে। শসা, কুমড়া প্রভৃতি পাতার শুঁয়ো লম্বা লম্বা, ফাঁপা ও রসভরা। আম, কাঁটাল, বেগুন প্রভৃতি পাতার নিচের পিঠে শুঁয়ো থাকে। বেগুনের পাতার উপর পিঠের শুঁয়ো লম্বা ও শক্ত হইয়া কাঁটায় পরিণত হয়।

পাতার রঙ ও পত্র-হরিত :

অধিকাংশ গাছের পাতার রঙ সবুজ। তবে, কচি অবস্থায় অনেক পাতা নীল, লাল বা হলুদে থাকে। পাতার ভিতর সবুজ রঙের এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য পদার্থ-কণা থাকে, উহাকে পত্র-হরিত বলে। উহাই পাতাকে সবুজ করে।

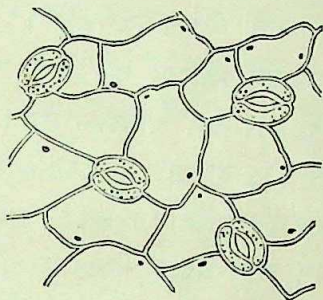
পাতা পাকস্থলীর কাজ করে :

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শিকড় মাটি হইতে জল ও অত্যন্ত খাবার সংগ্রহ করিয়া কাণ্ডে পৌঁছাইয়া দেয়; কাণ্ড আবার উহা পাতায় পৌঁছাইয়া দেয়। গাছের পাতার ছালে বা আবরণে বহু ছিদ্র আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত খালি চোখে এই সব ছিদ্র দেখা যায় না। এই সব

পাতার কথা

৩৩

ছিদ্রকে বায়ুপথ বলে। বাতাসে কার্বনিক এসিড নামক এক প্রকার গ্যাস আছে। পাতা বায়ুপথ দিয়া ঐ গ্যাস নিজের শরীরে ঢুকাইয়া লয়। তখন পত্র-হরিত এবং সূর্যের আলোকের সাহায্যে কার্বনিক এসিড গ্যাস এবং জল ও অগ্নি খাবার



পাতার বায়ুপথ।

(যাহা মাটি হইতে পাতায় আসে) নানারূপে একত্র মিশিয়া গাছের খাতরূপে পরিণত হয়। এই সমস্ত পদার্থ পাতার শিরা ও কাণ্ডের ভিতর দিয়া গাছের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহাতেই গাছের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। কাজেই, পাতা গাছের পাকস্থলীর কার্য্য করে।

পাতা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য চলে।

পাতার বায়ুপথ দিয়া বায়ু এবং বায়ুস্থিত অক্সিজেন নামক গ্যাস পাতার ভিতর প্রবেশ করে। এই অক্সিজেনের সাহায্যে জীবনের কাজ চলে। আর গাছের ভিতরে যে

৫—II

কার্বনিক এসিড গ্যাস জন্মে তাহা এবং কিছু জলীয় বাষ্প বায়ুপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইরূপে পাতা দ্বারা গাছপালার শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য চলে।

প্রাণীদিগের পক্ষে অক্সিজেন গ্যাস অত্যন্ত উপকারী এবং কার্বনিক এসিড গ্যাস অত্যন্ত অপকারী। দিনের বেলায় গাছপালা খাবার সংগ্রহ করিবার জন্য বায়ু হইতে কার্বনিক এসিড গ্যাস গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এইজন্য দিবাভাগে গাছপালার হাওয়া মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু রাত্রিকালে সূর্যের আলোর অভাবে গাছপালার আহাৰ বন্ধ থাকে, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে। তখন ইহারা প্রাণীদিগের মত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনিক এসিড গ্যাস ত্যাগ করে। এইজন্য রাত্রিকালে বৃক্ষের হাওয়া আমাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, পাতা যে শুধু গাছের তলার মাটি সরস রাখে তাহা নহে, পাতা গাছের খাবার পরিপাক করে ও পাতার দ্বারা গাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্যও চলে।

বাপ্প
দারা

ফুলের কথা

ফুলের বিভিন্ন অংশ :

এবং
বেলায়
বর্ষনিক
এইজন্য
স্থায়ক।

কয়েকটি ফুটন্ত ধুতুরার ফুল সংগ্রহ কর। এক্ষণে দেখ, ধুতুরা ফুলে চারিটি স্তবক বা থাক আছে ; যথা,—১। বহিস্তবক। ২। অন্তস্তবক। ৩। পুং-স্তবক। ৪। স্ত্রী-স্তবক।

বহিস্তবক :

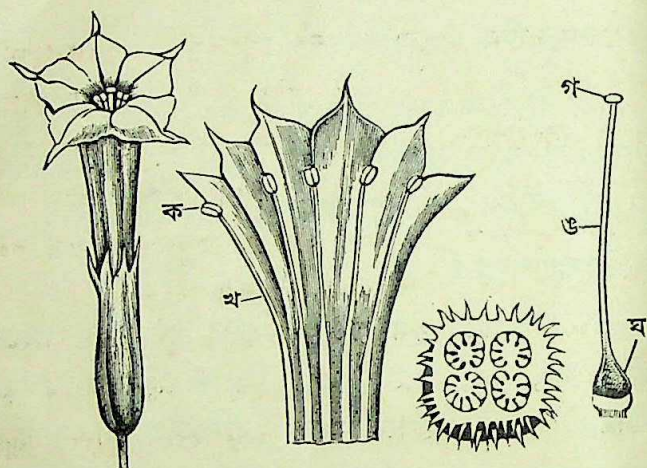
আহার
ইহারা
এসিড
মাদের
গাছের
গাছের
গাছের

একটি ধুতুরার ফুল লও। ফুলটির গোড়ায় বাহিরের দিকে দেখ, সবুজ রঙের একটি চোঙা ফুলের গোড়াটি জড়াইয়া আছে ; ইহাকে ফুলের বহিস্তবক বা বাহিরের থাক বলে। পাঁচটি পাতা বা পাপড়ি পাশাপাশি জুড়িয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। ইহার পৃথক্ পৃথক্ পত্রকে ছদ বলে। কোন ফুলে এই পত্র বা ছদগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে, আবার কোন ফুলে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে, তখন এই বহিস্তবক ফুলটিকে ঢাকিয়া রাখে।

অন্তস্তবক :

বহিস্তবক ছিঁড়িয়া ফেল। এখন দেখ, একটা সাদা লম্বা নল ফুলের ভিতরকার অংশ ঘিরিয়া রহিয়াছে; ইহাকে অন্তস্তবক বলে। পাঁচটি পাপড়ি পাশাপাশি মিলিত হইয়া ইহা গঠিত। লাউ, কুমড়া, আকন্দ প্রভৃতি ফুলেও পাপড়িগুলি যুক্ত থাকে।

কিন্তু গোলাপ, সরিসা প্রভৃতি ফুলে পাপড়িগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকে। পাপড়ির রঙ এবং আকার নানা ফুলে নানা



ধুতুরাফুল।

ক। রেণুকোষ।

গ। গর্ভচক্র।

খ। পুংদণ্ড।

ঘ। বীজকোষ।

ঙ। গর্ভদণ্ড।

রকম হয়। যেমন—ভুঁইকুমড়া, কলমি প্রভৃতির ফুলে উহা ঘণ্টার মত এবং তুলসী, বাসক প্রভৃতির ফুলে নিচের অংশ ঠোঁটের মত বুলিয়া থাকে।

পুং-স্তবক :

পুংকেশর।—পাপড়ির এক পাশে লম্বাভাবে চিরিয়া উহাকে ছড়াইয়া ধরিয়া দেখ, ভিতর দিকে উহার গায়ে পাঁচটি

ফুলের কথা

৩৭

সরু লম্বা দণ্ড লাগিয়া রহিয়াছে, উহাদিগকে পুংকেশর বলে।
পুং-স্তবকে এইরূপ পুংকেশর সাজান থাকে।

রেণুকোষ, রেণু ও পুংদণ্ড।—পুংকেশরগুলির
প্রত্যেকটির মাথায় দেখ, একটি করিয়া ছোট চেপ্টা থলি আছে;
উহাকে রেণুকোষ (ক) বলে। উহার ভিতর ধূলিকণার মত
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ আছে; উহাকে ফুলের রেণু বলে।
পুংকেশর পাকিলে রেণুকোষ ফাটিয়া রেণুসকল বাহির হইয়া
পড়ে। পুংকেশরের লম্বা দণ্ডকে পুংদণ্ড (খ) বলে।

পুংকেশর সব ফুলে সমান থাকে না। পদ্ম, গোলাপ
প্রভৃতি ফুলে অনেক পুংকেশর থাকে। কনক চাঁপা, জবা
প্রভৃতি ফুলে পুংকেশর-দণ্ডগুলি একত্র হইয়া একটি গোছা
হয়। মটর, শিম প্রভৃতি ফুলে দুইটি গোছা এবং কমলা
লেবু, কয়েত বেল প্রভৃতির ফুলে পুংকেশর-দণ্ডের বহু
গোছা হয়।

স্ত্রী-স্তবক :

গর্ভকেশর।—অন্য একটি ধূতুরার ফুল লও। ফুলের গোড়া
হইতে সবুজ চোড়া এবং সাদা নলটি সাবধানে খুলিয়া ফেল।
এখন দেখ, ফুলটির ঠিক মাঝখানে একটি লম্বা নলের মত দণ্ড
দাঁড়াইয়া আছে; উহাকে গর্ভকেশর বলে। স্ত্রী-স্তবকে এই
গর্ভকেশর থাকে।

গর্ভচক্র, বীজকোষ ও গর্ভদণ্ড।—গর্ভকেশরের মাথায়

পাগড়ির মত একটি অংশ রহিয়াছে; উহাকে গর্ভচক্র বা গর্ভাধার (গ) বলে। কোন কোন ফুলে দুইটি বা ততোধিক গর্ভচক্র থাকে। গর্ভকেশরের তলার মোটা ফাঁপা অংশের নাম বীজকোষ (ঘ) এবং মাবের সরু নলের মত অংশের নাম গর্ভদণ্ড (ঙ)। এখন বীজকোষটি সাবধানে চিরিয়া ফেল। দেখ, উহার ভিতর চারিটি কুঠরী এবং প্রত্যেক কুঠরীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক বীজ রহিয়াছে। এই বীজকোষ পুষ্ট হইয়া পরে ফলে পরিণত হয় এবং ঐ বীজগুলি ফলের ভিতর থাকিয়া যায়। কোনও ফুলের বীজকোষে একটি, কোনও ফুলের বীজকোষে দুইটি বা ততোধিক কুঠরী থাকে এবং প্রত্যেক কুঠরীতে একটি বা দুইটি অথবা ততোধিক বীজ থাকে।

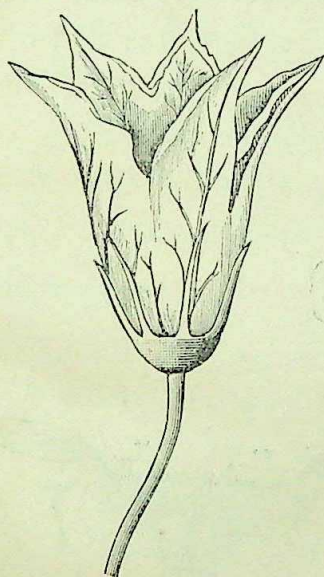
জবা, বক, কুম্ভচূড়া, শিমুল, কলিকা, শিম, মটর, লঙ্কা, বেগুন, কলমি, সরিসা প্রভৃতি ফুলে উপরি-উক্ত চারিটি স্তবক থাকে। ইহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ ফুল বলে। কিন্তু যে সকল ফুলে এই চারিটি অংশের কোন একটি বা দুইটি অংশ না থাকে, তাহাদিগকে অপূর্ণাঙ্গ বা অসম্পূর্ণ ফুল বলে। পদ্ম, চাঁপা, মনসাসিজ প্রভৃতির ফুলে বহিস্তবক থাকে না। আবার পান, পিপুল, চই প্রভৃতির ফুলে বহিস্তবক এবং অন্তস্তবক থাকে না। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের কোনও ফুলে পুংকেশর থাকে, কিন্তু গর্ভকেশর থাকে না; আবার কোনও ফুলে গর্ভকেশর থাকে, কিন্তু পুংকেশর থাকে না।

ফুলের কথা

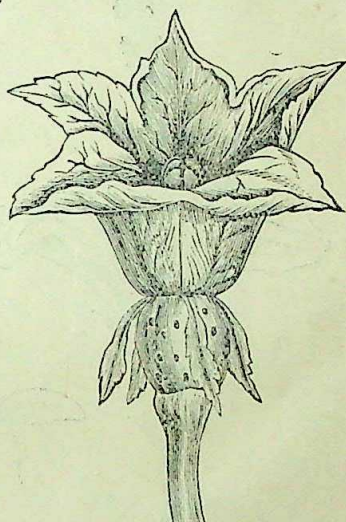
৩৯

পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প :

যে সমস্ত ফুলে পুংকেশর থাকে, কিন্তু গর্ভকেশর থাকে না, তাহারা পুংপুষ্প। আর যে সমস্ত ফুলে গর্ভকেশর থাকে, কিন্তু পুংকেশর থাকে না, তাহারা স্ত্রীপুষ্প। লাউ, কুমড়া, শসা



কুমড়ার পুংপুষ্প।

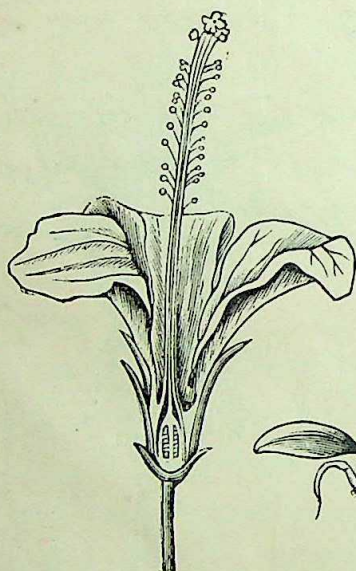


কুমড়ার স্ত্রীপুষ্প।

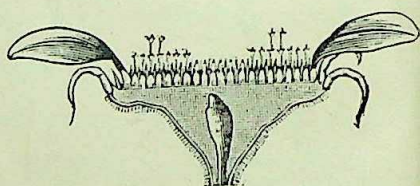
প্রভৃতি গাছে ঐ দুই প্রকারেরই ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তাল, পেঁপে প্রভৃতির কোন গাছে কেবল পুংপুষ্প এবং কোন গাছে কেবল স্ত্রীপুষ্প দেখা যায়।

পরীক্ষা—একটি জবা ফুল লইয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে,

উহার বহিস্তবকের নিচে বোঁটার গোড়াতে ছোট ছোট পাতা আছে ; উহাকে বৃত্তপত্র বলে । আর উহার সবুজ বহিস্তবকটি দেখিতে বাটির মত । অন্তস্তবকটির পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি পাপড়ি দেখ, উহাদের তলার দিকে সামান্য যুক্ত । তারপর দেখ, অনেকগুলি পুংকেশর একত্রে একটি দণ্ডের মত হইয়াছে এবং



চেরা-জবাফুল ।



সূর্যমুখী ফুল ।

ঐ দণ্ডটির ভিতরে গর্ভকেশর রহিয়াছে । গর্ভকেশরের তলার ডিমের মত অংশটি বীজকোষ । ইহা পাঁচটি কুঠরীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক কুঠরীতে অনেকগুলি করিয়া বীজ রহিয়াছে ।

ফুলের কথা

৪১

পাতা
সুবকটি
পাপড়ি
দেখ,
ছ এবং

সূর্যমুখী, গাঁদা, কদম প্রভৃতি ফুল দেখিলে মনে হয়, উহারা এক একটি ফুল। কিন্তু উহারা এক একটি ফুল নহে, অনেকগুলি ফুলের সমষ্টিকেই একটি ফুলের মত দেখায়। সূর্যমুখী ফুলকে ভাঙিয়া ফেলিলে কিরূপ দেখায়, পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ। যেগুলি হলদে পাপড়ি বলিয়া মনে হয়, সেগুলি এক একটি পৃথক্ ফুল। ঐ ছোট ছোট ফুলগুলি পুষ্পাধারের উপর সাজান থাকে।

আম, তুলসী, লিচু প্রভৃতি গাছে একটি লম্বা ডাঁটার গায়ে অনেক ফুল সাজান থাকে। নিচে হইতে ইহাদের ফুল ফুটিতে ফুটিতে ক্রমে উপর দিকে যায়।

ফুলের কাজ :

গাছপালা কিছু বড় হইলে, তাহাতে ফুল ধরে। ফুল হইতে ফল হয় এবং ফলের মধ্যে বীজ থাকে। পরে পুষ্ট বীজ হইতে জল, উত্তাপ ও বায়ুর সাহায্যে অঙ্কুর বাহির হয় এবং উহা ক্রমে বাড়িয়া চারাগাছে পরিণত হয়। চারাগাছ কিছু বড় হইলে আবার উহাতে ফুল ধরে। এইভাবে গাছ-পালার বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি হয়। অতএব, সুপুষ্ট বীজ উৎপাদন করাই ফুলের প্রধান কাজ।

ফুলের বীজ-উৎপাদন :

ফুল সম্পূর্ণরূপে ফুটিলে পুংকেশর পাকিয়া রেণুকোষ হইতে রেণু সকল বাহির হইয়া পড়ে। ফুলের রঙ, গন্ধ,

৬—II

মধু ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কীট-পতঙ্গাদি ফুলের উপর আসিয়া বসে। তখন উহাদের গায়ে ফুলের রেণু লাগিয়া যায়। পরে উহারা যখন অন্য ফুলে গিয়া বসে, তখন উহাদের গা হইতে রেণু সকল গর্ভচক্রে পড়ে। এই মিলনের পর বীজকোষে বীজ উৎপন্ন হইয়া যেরূপ ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে, বীজকোষও সেইরূপ ক্রমে বাড়িতে থাকে। তখন ফুলের অন্য কয়েকটি অংশ ক্রমশঃ খসিয়া পড়ে ও বীজকোষ বাড়িয়া ফলে পরিণত হয় এবং বীজ পুষ্ট হইলে ফল পাকে। কীট-পতঙ্গাদির সাহায্য ব্যতীতও বাতাস প্রভৃতির দ্বারা বাহিত হইয়া রেণু গর্ভচক্রের উপর আসিয়া পড়ে।

উপর
লাগিয়া
তখন
মিলনের
হইতে
তখন
বীজকোষ
পাকে।
বাহিত

ফলের কথা

ফলের বিভিন্ন অংশ :

ফলে সচরাচর তিনটি অংশ থাকে ; যথা,—১। খোসা,
২। শাঁস, ৩। বীজ। কিন্তু সব ফলেই এই তিনটি অংশ
থাকে না।

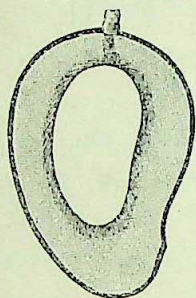
খোসা :

একটি আম লম্বালম্বি চিরিয়া পরীক্ষা কর। দেখ, আম
খাইবার সময় উপরকার যে আবরণটি আমরা ফেলিয়া দেই,
উহাই আমের খোসা।

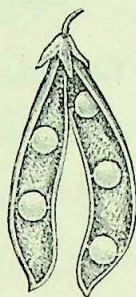
স্ফোটক ফল।—যে সমস্ত ফল পাকিলে খোসা
গুকাইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহাদের ভিতরকার বীজ মাটিতে
ঝরিয়া পড়ে, তাহাদিগকে স্ফোটক ফল বলে। মটর, শিম,
আকন্দ, শিয়ালকাঁটা, ধুতুরা, আফিঙ, ধুঁধুল, রাই, সরিসা
প্রভৃতি ফল পাকিলে ইহাদের খোসা ফাটিয়া যায়। কিন্তু,
ইহাদের খোসা ফাটিবার প্রণালী সবগুলির এক রকম
নহে। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, মটর, শিম প্রভৃতি
ফলের ছই পাশই ফাটিয়া যায় ; আকন্দ, বসন্ত করবী
প্রভৃতি ফলের এক পাশ ফাটিয়া যায় ; ধুতুরা ফলের
আগাগোড়াই প্রায় ফাটিয়া যায় ; আফিঙের ফলের মাথার

ছোটদের বিজ্ঞান

গোড়ায় ছিদ্র হয় ; সরিসা, মূলা প্রভৃতি ফলের বোঁটার দিক হইতে কাটিয়া যায়।



চেরা-আম।



ফাটা মটর ফল।

অক্ষোটক ফল।—যে সমস্ত ফল পাকিলে খোসা ফাটিয়া না যায়, তাহাদিগকে অক্ষোটক ফল বলে। বেগুন, পেয়ারা, শসা, আম, কুল, নারিকেল, সুপারি, ধান, গম, যব প্রভৃতি ফল পাকিলে ইহাদের খোসা ফাটে না। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, ইহাদের খোসা সব এক রকম নহে। বেগুন, পেয়ারা, শসা প্রভৃতি ফলের খোসা খুব পাতলা। নারিকেলের খোসা (বাহিরের পাতলা আবরণ) এবং তাহার নিচের স্তর দুইই নীরস। ধান, যব প্রভৃতির খোসাও নীরস।

শাঁস :

খোসা ফেলিয়া দিয়া আমের যে অংশ আমরা খাই, উহাই আমের শাঁস। কোন কোন ফলের শাঁস রসাল

ফলের কথা

৪৫

এবং কোন কোন ফলের শাঁস শুক হয়। কোন কোন ফলে আবার শাঁস থাকে না। জাম, লিচু, জামরুল, লাউ, কুমড়া, শসা, পেঁপে, পেয়ারা, বেগুন, তরমুজ, কলা, কুল ইত্যাদি ফলের শাঁস রসাল। নারিকেলের উপরের পাতলা আবরণটাই খোসা, খোসার নিচে ছোবড়া, যাহা দিয়া দড়ি কাছি প্রভৃতি তৈয়ার হয়, উহাই নারিকেলের শাঁস। ধান, গম, যব, ছোলা, মটর, আকন্দ প্রভৃতি ফলে শাঁস থাকে না; ইহাদের বীজ খোসাতে ঢাকা থাকে।

বীজ :

আমের শাঁস অর্থাৎ রসাল অংশ খাইয়া উহার ভিতরকার আঁটি আমরা ফেলিয়া দেই। ঐ আঁটিটির উপরকার শক্ত আবরণটি কাটিয়া ফেলিলে উহার ভিতর হইতে যে জিনিস বাহির হয়, তাহাই আমের বীজ। বীজসহ এইরূপ শক্ত আবরণকে আঁটি বলে। অনেক ফলে এইরূপ আঁটি থাকে এবং সেই আঁটির শক্ত আবরণের মধ্যে বীজ থাকে। আবার অনেক ফলের ভিতর কেবল বীজ থাকে, আঁটি থাকে না।

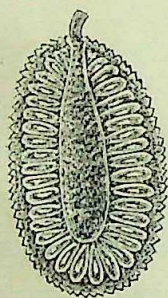
নারিকেল, তাল, কুল, জলপাই প্রভৃতি ফলের মধ্যে আঁটি থাকে। নারিকেলের কঠিন খোলার ভিতর যে সাদা অংশ ও জল থাকে, উহাই বীজ। তালের ভিতর তিনটি আঁটি থাকে। কুল, জলপাই প্রভৃতির ভিতর এক একটি আঁটি থাকে।

লেবু, পেঁপে, লাউ, কুমড়া, তরমুজ, শসা, পেয়ারা,

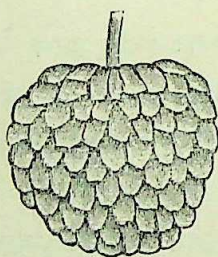
ডালিম, বেগুন, উচ্ছে, আঙুর প্রভৃতি ফলের মধ্যে বহু বীজ থাকে। ধান, গম, যব প্রভৃতি ফলের মধ্যে একটি করিয়া বীজ থাকে। মটর, শিম, রাই, সরিসা প্রভৃতি প্রায় সমুদায় স্ফোটক ফলেই অনেকগুলি করিয়া বীজ থাকে।

পুঞ্জীফল :

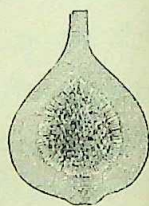
অনেকগুলি ছোট ছোট ফল একত্র হইয়া একটি ফলের মত দেখায়; এইরূপ ফলকে পুঞ্জীফল বলে। কাঁটাল, আনারস, আতা, ডুমুর, অশ্বথ প্রভৃতি এই জাতীয় ফল।



চেরা-কাঁটাল।



আতা।



চেরা-ডুমুর।

কাঁটালের ভিতর বহু কোষ থাকে এবং প্রত্যেক কোষের মধ্যে এক একটি বীজ থাকে। কাঁটালের প্রত্যেকটি কোষ এক একটি ফুল হইতে উৎপন্ন এক একটি পৃথক্ ফল, বহু ফল একটা খোসায় ঢাকা থাকে মাত্র।

আনারসও কাঁটালের মত বহু ফুল হইতে উৎপন্ন বহু

ফলের কথা

৪৭

ফলের সমষ্টি। আনারসের খোসা ছাড়াইয়া যে অংশ আমরা খাই, উহার ভিতর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বীজ থাকে।

কাঁটাল ও আনারসের মত আতাও বহু ফলের সমষ্টি। কিন্তু, আতা বহু ফুল হইতে উৎপন্ন হয় না। ইহা বহু বীজকোষযুক্ত একটি ফুল হইতে উৎপন্ন হয়। আতার ভিতরও বহু বীজ থাকে।

অগাছ ফুলের মত ডুমুরের ফুল বাহির হইতে দেখা যায় না, উহা ডুমুরের ভিতর থাকে। বাহাকে আমরা ডুমুরের ফল বলি, উহা বাস্তবিক ফল নহে; উহা ডুমুর ফুলের পুষ্পাধার। সূর্য্যমুখীর ছোট ছোট বহু ফুল পুষ্পাধারের উপর সজ্জিত থাকে এবং বাহির হইতে দেখা যায়। কিন্তু, ডুমুরের ছোট ছোট ফুল উহার পুষ্পাধারের ভিতর দিকে গায়ে সাজান থাকে। সেজন্য বাহির হইতে উহার ফুল দেখা যায় না। ঐ সকল ফুল হইতে সরিসা অপেক্ষাও ছোট ছোট বহু ফল জন্মে। পাকা ডুমুর চিরিলে তাহার মধ্যে যেগুলিকে ছোট ছোট বীজের মত দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি বীজ নহে, উহারা এক একটি ফল। বট এবং অশ্বথের ফলও ঠিক ডুমুরের মত।

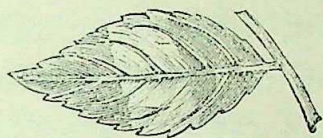
আলোকের সহিত গাছপালার সম্বন্ধ

আলোক গাছপালার প্রাণস্বরূপ। আলোক না পাইলে গাছপালায় পত্র-হরিত জন্মে না এবং তাহাদের পাতা প্রভৃতিও সবুজ হয় না। আমরা 'পাতার কথা' অধ্যায়ে দেখিয়াছি, পাতার বায়ুপথ দিয়া বাতাসের সঙ্গে কার্বনিক এসিড গ্যাস পাতার ভিতর প্রবেশ করিলে পত্র-হরিতের কণাসকল ঐ গ্যাস টানিয়া লয়। পরে পত্র-হরিত এবং আলোকের সাহায্যে কার্বনিক এসিড গ্যাস ও জল এবং অল্প খাদ্য পাতায় পরিপাক প্রাপ্ত হওয়ায় গাছপালার দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। কাজেই দেখা বাইতেছে, আলোক না পাইলে গাছপালার রঙ সবুজও হয় না এবং সবুজ রঙ না থাকিলে গাছপালার খাদ্যও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। অতএব আলোক না পাইলে গাছপালা অনাহারে মরিয়া যায়।

পরীক্ষা।—তোমরা কতকটা স্থানের সবুজ ঘাসের উপর একখণ্ড চাটাই চাপা দিয়া রাখ। কয়েক দিন পরে চাটাই তুলিয়া দেখ, সবুজ ঘাসগুলি সাদা ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। চাটাইখানা সরাইয়া ফেল। কয়েক দিন পরে দেখিবে, আলোক পাইয়া ঘাসগুলি আবার সবুজ ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদিন এইরূপ চাপা দেওয়া থাকিলে

আলোকের সহিত গাছপালার সম্বন্ধ ৪৯

আলোক অভাবে ঘাসগুলি মরিয়া যাইত। ইহাতেই বুঝা যায়, আলোক না পাইলে গাছপালার রঙ সবুজ হয় না এবং সবুজ রঙ অভাবে খাদ্য পরিপাক না হওয়ায় গাছপালা অনাহারে মরিয়া যায়।



টিন দিয়া ঢাকা পাতা।

চিত্রে দেখ, একটি গাছের পাতার কতকটা অংশ একখণ্ড টিনের দ্বারা ঢাকিয়া রাখায়, উহার সেই অংশটি কিরূপ সাদা হইয়া গিয়াছে।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, বড় বড় গাছের ছায়ায় বা অন্ধকারময় স্থানে যে সকল গাছপালা জন্মে, তাহারা আলোকের দিকে বাঁকিয়া বাড়িয়া উঠে। আরও দেখিবে, গাছপালা আপন পাতা সমূহকে আলোকের দিকে তুলিয়া ধরে। আবার কাণ্ড এবং ডালপালার গায়ে পাতা এরূপ কৌশলে সাজান থাকে, বাহাতে প্রত্যেকটি পাতাই আলোক পাইতে পারে এবং একটি অণ্ডটিকে ঢাকিতে বা আড়াল করিতে না পারে।

গাছপালা চিনিবার প্রণালী

আমরা সদাসর্বদা অসংখ্য রকমের গাছপালা দেখিতে পাই। আম, জাম, কাঁটাল, বট, নারিকেল, বাঁশ, পেঁপে, লাউ, কুমড়া, মটর, বেগুন প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গাছ আমরা চিনি। কিন্তু, এমন অনেক গাছ আছে, যাহা আমরা চিনি না। গাছ চিনিতে হইলে, মোটামুটি কতকগুলি বিষয় জানিয়া রাখা দরকার; যথা—গাছের কাণ্ড ও ছাল কিরূপ, কাণ্ডে ডালপালা হয় কিনা, পাতা কিরূপ, ফুল হয় কিনা, কখন ফুল হয়, ফুল দেখিতে কি রকম, ফুল হইতে কখন এবং কিরূপ ফল হয়, কখন ফল পাকে, গাছের শিকড় কিরূপ, গাছ কতদিন বাঁচে, ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয় জানা থাকিলে, গাছ দেখিয়া কোন্টি কি গাছ সহজেই চেনা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি সাধারণ গাছের পরিচয় দেওয়া গেল।

আম গাছ :

আম গাছ বাংলা দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। আম গাছ বেশ বড় হয়। ইহার গুঁড়ি মোটা, গোলাকার ও শক্ত হয়। মাটি হইতে কিছুটা উপরে গিয়াই গুঁড়ির গা হইতে লম্বা লম্বা ডালপালা বাহির হইয়া গাছটি বাঁকড়া হইয়া দাঁড়ায়।

গাছপানা চিনিবার প্রণালী

৫১

আম গাছের ছাল বেশ পুরু হয় ; উহার বাহিরের দিকের পুরাতন ছাল শুক ও ফাটা ফাটা। আম গাছের ছালের ভিতর দিকে শক্ত কাঠ, উহার আবার বাহিরের দিকের কাঠ অপেক্ষা ভিতর দিকের কাঠ বেশি শক্ত হয়। গুঁড়ির কাঠ আমাদের অনেক কাজে লাগে। উহাতে তক্তা প্রভৃতি হয়। আমের পাতা লম্বা ও সবুজ ; ইহাতে একটি মাত্র ফলক থাকে। ইহার পাতার ধার সরল এবং পাতার শিরাগুলি পক্ষ-শিরা। পাতার উপরের পিঠ মসৃণ ও চক্চকে এবং তলার পিঠ কতকটা খস্খসে। আম গাছে প্রথমে মঞ্জরি বাহির হয় এবং ঐ মঞ্জরিতে অনেক ফুল থাকে। পরে ঐ ফুল হইতে ফল হয় এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগ হইতে আম পাকিতে আরম্ভ করে। পাকা আম সুমিষ্ট। আমের ভিতর ইহার বীজ থাকে এবং বর্ষাকালে আমের বীজ হইতে চারা বাহির হয়।

এক্ণে দেখ, আম গাছ যদি তোমাদের চেনা না থাকিত, তথাপি উপরি-উক্ত বিষয়গুলি জানা থাকিলে, তোমরা অনায়াসে আম গাছ দেখিয়া চিনিতে পারিতে। জাম, কাঁটাল, বট, অশ্বথ, পেয়ারা, জামরুল প্রভৃতি গাছগুলির সহিত আম গাছের তুলনা করিয়া দেখ, কোন্টা কিরূপে চেনা যায়।

নারিকেল গাছ :

নারিকেল গাছ এক-বীজপত্রী। ইহার গুঁড়ি হইতে ডাল বাহির হয় না। ইহার গুঁড়ি সরল, লম্বা ও গোলাকার। ইহার

গুঁড়ির কাঠ তত বেশি শক্ত নয়। নারিকেল গাছের গুঁড়ির মাথায় বড় বড় পাতা সাজান থাকে। ইহার পাতায় বেঠনী, বোঁটা, মধ্য-শিরা অর্থাৎ র্যাকিস (Rachis) আছে এবং র্যাকিসএর গায়ে সরু লম্বা লম্বা বহু ফলক সাজান থাকে। কচি অবস্থায় নারিকেল ফলকে ডাব বলে। ডাবের জল উৎকৃষ্ট পানীয় ও পথ্য। নারিকেলের শাঁস অর্থাৎ ছোবড়া দিয়া দড়ি, কাছি ইত্যাদি তৈয়ার হয়। নারিকেল গাছের গোড়ায় গোছা শিকড় হয়। তাল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি গাছের সহিত ইহার তুলনা কর।

কুমড়া গাছ :

ইহা দ্বি-বীজপত্রী গাছ। কুমড়া গাছের কাণ্ড অর্থাৎ ডাঁটা লম্বা, সরু ও লতানে। ইহার গাঁইট হইতে আঁকুড়ি বাহির হয় এবং ঐ আঁকুড়ি দ্বারা অণু আশ্রয়কে জড়াইয়া ধরিয়া এই গাছ উপর দিকে বাড়িয়া উঠে। ইহার পাতা ও ডাঁটায় গুঁয়ো থাকে। ইহার পুষ্প হলুদে এবং একই গাছে স্ত্রী ও পুংপুষ্প উভয় প্রকার পুষ্পই হয়। কুমড়া ফল বেশ বড় হয় এবং ফলের মধ্যে অনেক বীজ থাকে। লাউ, শসা, উচ্ছে, শিম প্রভৃতি গাছের সহিত ইহার তুলনা কর।

প্রকৃতি-পঞ্জিকা

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের গাছপালা আছে। তোমাদিগকে এ পর্য্যন্ত গাছপালার সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। আবার শুধু পুস্তকে গাছপালার বিবরণ পড়িলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। নিজেরা গাছপালার সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিলে, তবেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইবে। তোমরা গাছপালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণের ফল অল্প কথায় সুশৃঙ্খলভাবে পৃথক্ পৃথক্ একখানা খাতায় লিখিয়া রাখিবে। দিন দিন গাছপালার কোন্ কোন্ অংশের কি কি পরিবর্তন হয়, তাহা দেখিয়া এই খাতায় লিখিয়া রাখিবে। যে সব গাছপালা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, তাহাদের ডাল, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতির চিত্র ঐ খাতায় আঁকিয়া রাখিবে। গাছের শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের বিবরণ নিম্নলিখিতরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিয়া রাখিবে। যেমন, পাতার বিবরণ লিখিতে হইলে,—পাতার আকৃতি, ফলক, বোঁটা, বেঁটনী, ধার, শিরা ইত্যাদির বিষয় এবং কখন পাতা ঝরিয়া পড়ে, কখন নূতন পাতা বাহির হয় ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবে।

গাছের নাম...

তারিখ	শিকড়	কাণ্ড	পাতা	ফুল	ফল	বীজ	বিশেষত্ব	মন্তব্য
-------	-------	-------	------	-----	----	-----	----------	---------

বন্য ফুল সংগ্রহ

বাগানে যে সমস্ত গাছপালা আমরা যত্ন করিয়া রোপণ করি, তাহাদের ফুল, ফল ইত্যাদি আমরা ইচ্ছা করিলেই যখন তখন পরীক্ষা করিতে পারি। কিন্তু, বনজঙ্গলে যে সব গাছপালা জন্মে উহাদেরও ফুল, ফল হয় এবং শেষে বারিয়া পড়ে। এই সমস্ত বন্য গাছপালার ফুল, ছোট ফল ও পাতা সমেত ছোট ডাল সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। এক্ষণে ইহাদের সংরক্ষণের প্রণালী বলিতেছি। ফুল, ফল ও পাতা সমেত ডাল বা চারাগাছ কাটিয়া আনিয়া ছুইখানা ব্লটিং পেপারের মাঝে বেষণ করিয়া পাতাইয়া রাখিয়া ব্লটিং পেপারের উপর ভারি জিনিস চাপা দিয়া রাখিবে। একদিন পরে ভার সরাইয়া দেখিবে ফুল, পাতা ইত্যাদি ঠিকমত পাতান আছে কিনা। যদি কোথাও কুঁচকাইয়া গিয়া থাকে, তবে ঠিক করিয়া পাতাইয়া দিয়া পুনরায় ভার চাপা দিয়া রাখিবে। ৮১০ দিন পরে ভার তুলিয়া দেখিবে ফুল, পাতা ইত্যাদি বেষণ শুকাইয়া গিয়াছে। তখন আঠা বা স্নুতা দ্বারা উহা একখানা খাতার কাগজে আটকাইয়া রাখিবে। যখনই সময় পাইবে, নিকটস্থ বন্য ফুল সংগ্রহ করিয়া এইরূপে শুকাইয়া রাখিবে। ঐ খাতায় ফুলের নিচে ফুল সংগ্রহের তারিখ ও স্থান এবং ফুল, ফল, পাতা, গাছ প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হয়।

কীট-পতঙ্গ

সমগ্র পৃথিবীতে মোটামুটি হিসাবে পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার রকমের ছোট বড় প্রাণী আছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীতে প্রায় চারি লক্ষ রকমের কীট-পতঙ্গ আছে। কীট-পতঙ্গকে আমরা চলিত কথায় পোকা বলিয়া থাকি। পিপীলিকা, মৌমাছি, মশা, প্রজাপতি প্রভৃতি পোকারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের প্রকৃতি ও আকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও, ইহাদের শারীরিক গঠনে অনেক সাদৃশ্য আছে। সেজন্য ইহাদিগকে এক শ্রেণীতে ধরা হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ :

পোকাদের শরীর মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা,—১। মাথা, ২। বুক, ৩। উদর।

চোখ :—পোকাদের মাথার ভাগে দুই পাশে দুইটি বড় চোখ আছে। প্রত্যেকটি বড় চোখ আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের সমষ্টি। কাজেই, ইহারা সহজেই চারি পাশে দেখিতে পায়। ঐ বড় চোখ দুইটির মাঝখানে আরও ২৩টি ছোট চোখ থাকে। ইহা দ্বারাও উহারা দেখিতে পায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে, একটি মাছির মাথায় প্রায় চারি হাজার চোখ, প্রজাপতির প্রায় সতের হাজার এবং গোবরে পোকার প্রায় পঁচিশ হাজার চোখ দেখা যায়।

শুঁড় ও মুখ :—পোকাদের চোখের সম্মুখ ভাগের দুইপাশে দুইটি শুঁড় আছে। ইহারা শুঁড় দুইটিকে সব দিকে ঘুরাইতে পারে। ইহারা এই শুঁড় দ্বারা স্পর্শ করিয়া জিনিস শক্ত কি নরম, গরম কি ঠাণ্ডা, ইত্যাদি বুঝিতে পারে এবং ইহা দ্বারা জিনিসের গন্ধও অনুভব করে। আবার যাহারা শক্ত জিনিস চিবাইয়া খায়, তাহাদের মাথায় নিচের দিকে মুখ ও চিবাইবার জন্য বেশ শক্ত চোয়াল আছে।

নুক, পা ও ডানা :—পোকাদের বুকের অংশটা পাতলা আংটির মত শক্ত বেড় দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ পোকার বুক আংটির মত মাত্র তিনটি বেড় এবং প্রতি বেড়ে দুইখানি করিয়া মোট ছয় খানি পা থাকে। যে সব পোকার ডানা বা পাখা আছে, তাহাদের বুকের ভাগে পিঠের দিকে ডানা লাগান থাকে।

উদর ও শ্বাসযন্ত্র :—পোকাদের উদরের ভাগটি প্রায়ই আংটির মত নয়টি বেড় দ্বারা গঠিত। উহাদের উদরের দুই পাশে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। ঐ সকল ছিদ্র দ্বারা পোকাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য চলে এবং বাতাস যাতায়াতের জন্য পোকাদের উদর সর্বদা কাঁপিতে থাকে। এই কারণে, জোনাকি পোকার আলোক একবার নিভে ও একবার জ্বলে। যে সব পোকার হল আছে, তাহাদের হল উদরের শেষ প্রান্তে থাকে।

পোকাদের দেহে হাড় বা শিরদাঁড়া নাই। তবে,

কীট-পতঙ্গ

৫৭

ইহাদের দেহে মাংসের মত নরম জিনিস আছে এবং
ইহাদের দেহটা হাড়ের মত শক্ত আবরণে ঢাকা।

জন্ম-বিবরণ :

সাধারণতঃ পোকাদের জীবনের চারিটি অবস্থা দৃষ্ট হয় :—

১। প্রথম অবস্থা—ডিম্ব।

২। দ্বিতীয় অবস্থা—শূককীট।

৩। তৃতীয় অবস্থা—গুটি।

৪। চতুর্থ অবস্থা—পূর্ণদেহ পোকা।

ডিম্ব :

পোকারা একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। ইহাই
পোকাদের জীবনের প্রথম অবস্থা।

শূককীট :

ডিম হইতে এক প্রকার কীট বাহির হয় ; ইহাকে শূককীট
বলে—ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় ইহারা প্রথম
প্রথম বড়ই ক্ষুধার্ত থাকে। তখন ইহারা একটুও বিশ্রাম
না করিয়াই অনবরত খাইতে থাকে। ইহারা যেমন খায়,
তেমনই হজম করে এবং শীঘ্র শীঘ্র ইহাদের শরীরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হয়। শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কয়েকবার খোলস
ত্যাগ করে।

গুণ্ডি :

শুককীট অবস্থায় কয়েকবার খোলস ত্যাগ করিবার পরে, ইহাদের আহারের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কনিয়া আসে। তখন ইহারা আহার বন্ধ করিয়া এক স্থানে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহাদের শরীরের চারি দিকে একটা খোলসের সৃষ্টি হয়। তখন শুককীট খোলসের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চুপ করিয়া থাকে — এই অবস্থাকে গুণ্ডি বলে। শুককীট যখন গুণ্ডির মধ্যে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, তখন ইহার শরীরের আর এক পরিবর্তন হয় ; ইহাকে পুত্তলি বলে।

পূর্ণদেহ পোকা :

গুণ্ডির ভিতর শুককীট পুত্তলিতে রূপান্তরিত হওয়ার পরে উহার আকৃতির আরও পরিবর্তন হইতে থাকে। অবশেষে কাল পূর্ণ হইলে গুণ্ডির আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণদেহ পোকা বহির্গত হয়।

আরম্ভে, ফড়িং প্রভৃতি কয়েক রকমের পোকায় ডিম হইতেই ছোট বাচ্চা পোকা বাহির হয়। পরে উহারা বার বার খোলস ত্যাগ করিয়া বড় হইয়া থাকে।

পিঁপড়ালিকা

পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া পিঁপড়ার মত এমন বুদ্ধিমান প্রাণী আর নাই। পিঁপড়ার দলবদ্ধ হইয়া সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মহানুভূতি, একতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের অভাব নাই। পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার রকমের পিঁপড়া আছে। ইহাদের জীবনের ইতিহাসে মোটের উপর অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ভাবভঙ্গী চালচলনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমাদের দেশে ডেঁয়ে পিঁপড়া, ক্ষুদে পিঁপড়া, মেঝেল পিঁপড়া, সুড়সুড়ে পিঁপড়া, নালুসে পিঁপড়া প্রভৃতি কয়েক প্রকার পিঁপড়া আমরা সর্বদা দেখিতে পাই।

শ্রেণী-বিভাগ :

পিঁপড়াদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখা যায় :—

১। স্ত্রী বা রাণী, ২। পুরুষ, ৩। কর্ম্মী।

স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ার দুই জোড়া করিয়া পাতলা ডানা থাকে। আর যাহাদের ডানা থাকে না, ইহারাই কর্ম্মী পিঁপড়া ; ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি।

জন্ম-নিবরণ :

তোমরা নিশ্চয়ই পিঁপড়ার সারি দেখিয়াছ। এক দলের সকল পিঁপড়াই এক মাতার সন্তান। পিঁপড়া-মাতাকে রাণী

বলা যাইতে পারে। সন্তানেরা রাণীকে যথেষ্ট যত্ন ও সম্মান করে।

জন্মবার কিছু পরে ডানায়ুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়া একসঙ্গে আকাশ-বিহারে চলিয়া যায়। পুরুষেরা খুব অল্পায়ু। আকাশ-বিহারের কিছু পরেই ইহারা মারা যায় বা পাখী, বেঙ প্রভৃতি



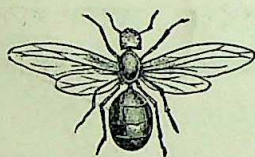
ডিম।



শূককীট।



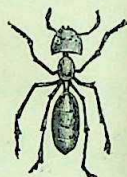
গুটি।



রাণী।



পুরুষ।



কর্মী।

কর্তৃক ভক্ষিত হয়। রাণী আকাশ-বিহারের পর ঘাসে বা পাথরে ঘসিয়া অথবা নিজের পা দিয়াই নিজের ডানা ছিঁড়িয়া ফেলে। তারপর রাণী মাটির মধ্যে গর্ত করিয়া সেখানে কুঠরী তৈয়ার করে এবং পরে উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই কুঠরীর মধ্যে থাকিয়া রাণী ডিম প্রসব করিতে থাকে। এইরূপে মাসের পর মাস কাটিয়া যায়। এই সময় রাণী নিজের শরীরের চর্বি ও ডানা সঞ্চালনের মাংসপেশী হজম করিয়া

বাঁচিয়া থাকে। পরে ডিম হইতে শূককীট জন্মে। শূককীট মাতার শরীরের চৰ্ব্বি এবং ছিন্ন ডানার মাংসপেশী খাইয়া ক্রমে গুটিতে পরিণত হয়। প্রথম বারের এই সমস্ত গুটি কাটিয়া প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ কৰ্ম্মী পিঁপড়া বাহির হয়।

কৰ্ম্ম-বিভাগ :

স্ত্রী ও পুরুষ।—ডিম প্রসব করাই রাণীর একমাত্র কাজ। তবে প্রথম বারের ডিম, শূককীট এবং গুটির লালনপালন রাণীমাতা নিজেই করে। তৎপর হইতে রাণী কেবল ডিম প্রসব করিতে থাকে। এইরূপে এক একটি রাণী ১৫১২০ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিয়া থাকে। রাণীর শরীরের আয়তন পুরুষের চেয়ে বড়। পুরুষেরা অলস, কোন কাজ করে না। ইহাদের সংখ্যা খুব কম।

কৰ্ম্মী।—ইহারাই সংসারের যাবতীয় কাজ করে। ইহারা আবার নিজেদের মধ্যে কার্য্যের বাটোয়ারা করিয়া লয় এবং প্রত্যেকেই নিপুণতার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ ঘর প্রস্তুত ও মেরামত করে, কেহ ঘরবাড়ি পাহারা দেয়, কেহ সরদারী করে, কেহ চরের কাজ করে, কেহ সৈনিকের কাজ করে, কেহ খাদ্য বহিয়া আনে, কেহ বা রাণী-মাতার সেবা করে এবং ডিম, শূককীট ও গুটিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, একই জাতীয় পিঁপড়ার

সারিতে অপেক্ষাকৃত বড় ও মোটা কতকগুলি পিঁপড়া দেখা যায়—ইহারাই সর্দার। কিন্তু ইহারা সংখ্যায় খুব কম। ইহারা শ্রমিকদিগের কাজ দেখাশুনা করে।

তোমরা আরও দেখিবে, ঘরবাড়ি বদলাইবার সময় কতকগুলি পিঁপড়া ডিম, শূককীট এবং গুটি মুখে করিয়া নূতন বাড়িতে বহিয়া লইয়া যায়—ইহারাই ধাত্রী পিঁপড়া।

পিঁপড়াদের মধ্যে যাহারা চর বা দূতের কাজ করে, তাহারা বাহিরে গিয়া খাওয়ার সন্ধান করিয়া বাসায় ফিরিয়া সংবাদ দেয়। তখন চরের নির্দেশ অনুযায়ী বাহক, মিস্ত্রী, সর্দার, সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি চরের ফিরিবার নির্দিষ্ট রাস্তা ধরিয়া গিয়া খাও বহিয়া বাসায় আনে। আর যে সমস্ত খাও বহিয়া বাসায় আনা সম্ভব নয়, তাহা সকলে মিলিয়া খাইয়া আসে। আহাৰ্য্য অতিরিক্ত হইলে, ইহারা ভবিষ্যতের জন্য বাসায় সঞ্চয় করিয়া রাখে। কোনও পিঁপড়া খাবার মুখে করিয়া বাসায় ফিরিবার পথে যদি নিজ দলের কোনও ক্ষুধার্ত পিঁপড়া খাবার চাহে, তবে সে তাহাকে খাবার দিয়া দেয়।

পিঁপড়া নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বেশি ওজনের জিনিস বহিয়া লইয়া যাইতে পারে।

কীট-পালন :

পিঁপড়ারা এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আনিয়া নিজেদের বাড়িতে পুষ্টি থাকে। আবশ্যকমত পিঁপড়ারা ঐ সকল কীটের শরীরে

শিশীলিকা

৬৩

গুঁড় দিয়া সুড়সুড়ি দিতে থাকে; ইহাতে উহাদের শরীর হইতে মধুর মত এক প্রকার মিষ্ট রস বাহির হয়। তখন পিপড়ারা ঐ মিষ্ট রস পান করে।

কৃষিকার্য :

পিপড়ারা বেঙের ছাতা নামক উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিজেদের বাসস্থানের চারিপাশে ভিজা জমিতে বপন করে। পরে বীজ হইতে গাছ জন্মিলে পিপড়ারা উহা খাইয়া থাকে।

খাদ্যদ্রব্য :

গুড়, চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য, নানাবিধ শস্য ও ফল, মরীচ এবং পচা জীবজন্তু প্রভৃতি এবং মানুষের সর্বপ্রকার খাত্তই ইহারা খাইয়া থাকে।

বাসগৃহ :

প্রথমে রাণী মাটির নিচে গর্ত করিয়া তথায় ডিম প্রসব করে। কক্ষী পিপড়ার দল গুটি হইতে বাহির হইয়াই রুদ্ধ গৃহের দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া তরল খাত্ত আনিয়া রাণীকে খাওয়ায় এবং গর্তের চারিপাশে খুঁড়িয়া বাসগৃহ বড় করে। ইহাদের বাসা কয়েক তলায় বিভক্ত। প্রত্যেক তলায় আবার কয়েকটি করিয়া কুঠরী থাকে। পৃথক্ পৃথক্

কুঠরীতে ডিম, শূককীট এবং গুটি পৃথগ্ভাবে রাখিয়া কন্মীরা উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। নিম্ন তলায় নিরিবিলা স্থানে রাণী বাস করে। নাল্‌সে জাতীয় পিঁপড়ারা গাছের পাতা জড়াইয়া বাসা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে।

পিঁপড়ার বাসা এক একটি রাজ্য বিশেষ। হাজার হাজার পিঁপড়া একসঙ্গে একই বাসায় বাস করে। কিন্তু ইহারা পরস্পরের মধ্যে কোনও গোলমাল, মনোমালিগ্ন না করিয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে।

মানুষের কি উপকার করে ?

পিঁপড়ারা মিষ্ট দ্রব্য এবং অগ্ন্যান্ত খাবার খাইয়া যে শুধু আমাদের অনিষ্টই করে, তাহা নহে ; ঘরবাড়ির যেখানেই যে খাণ্ডটুকু পড়িয়া থাকুক না কেন, পিঁপড়ারা উহা খাইয়া ফেলে বা বাসায় বহিয়া লইয়া যায়। এইরূপে পিঁপড়ারা ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখিয়া আমাদের উপকারও করে।

কোন কোন দেশে উই তাড়াইবার জন্ত দুই রকমের পিঁপড়া ঘরে আনা হইয়া থাকে। পিঁপড়ারা উই, ছারপোকা প্রভৃতি খাইয়া ফেলে।

কর্মীরা
রিবিলি
গাছের

হাজার
ইহারা
করিয়া

যে শুধু
নই যে
ফেলে
রবাড়ি

পিঁপড়া
প্রভৃতি

মধুমক্ষিকা

শীতপ্রধান দেশ ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশেই মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও, বুদ্ধি কৌশলে নিরাপদ স্থানে সুন্দর চাক প্রস্তুত করে এবং সেই চাকে আবার অসময়ের জন্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। ইহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই অবাক হইতে হয়। হাজার হাজার মৌমাছি দলবদ্ধ হইয়া সমাজ বাঁধিয়া একই চাকে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে বাস করে। ইহাদের মুখে চোয়ালের নিচে ফুল হইতে মধু চুষিয়া লইবার উপযুক্ত ক্ষুদ্র লোমওয়ালা গুঁড় আছে। মৌমাছিদের প্রত্যেকেরই চারিখানা করিয়া পাতলা ডানা আছে।

শ্রেণী-বিভাগ :

পিঁপড়ার ন্যায় মৌমাছিদের মধ্যেও তিনটি শ্রেণী আছে :—

১। জ্ঞী বা রাণী, ২। পুরুষ, ৩। কর্মী।

জ্ঞী বা রাণী।—গঠনে কিছু বড় ও তাহার শরীর লম্বা এবং গায়ের রঙ উজ্জ্বল। ইহার লেজে হল নাই বলিলেও চলে। রাণী তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

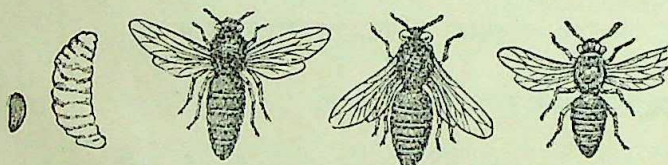
পুরুষ।—শরীর বেশ মোটা। ইহাদের লেজে হল নাই। ইহাদের গায়ে লোম বেশি। ইহাদের বড় চোখ দুইটি মাথার উপরের দিকে অবস্থিত। ইহারা দুই মাস পর্য্যন্ত বাঁচে।

কর্ম্মী।—গঠনে ছোট, কিন্তু বলিষ্ঠ। ইহাদের লেজে হল আছে। ইহাদের পিছনের পায়ে ফুলের রেণু সংগ্রহের জন্য চুপড়ি এবং পাকস্থলীর পাশে মধু সঞ্চয়ের থলি আছে। ইহাদের শরীরে মোম রাখিবার পকেট আছে। কর্ম্মী মৌমাছি তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

জন্ম-বিবরণ :

প্রত্যেক চাকে একটি স্ত্রী বা রাণী ও অল্প সংখ্যক পুরুষ এবং হাজার হাজার কর্ম্মী মৌমাছি থাকে।

কর্ম্মীরাই মোম দ্বারা মৌচাক প্রস্তুত করে। মৌচাক ছয় কোণযুক্ত বহুসংখ্যক কুঠরীর সমষ্টি। চাক প্রস্তুত হইলে



ডিম। শূককীট।

রাণী।

পুরুষ।

কর্ম্মী।

রাণী কয়েকটি পুরুষ সঙ্গে লইয়া আকাশ-বিহারে চলিয়া যায় এবং অল্প সময় বেড়াইয়া চাকে ফিরিয়া আসে। ইহার ২০ দিন পর হইতে রাণী কয়েকটি কর্ম্মী মৌমাছিকে সঙ্গে লইয়া চাকের প্রতি কুঠরীতে একটি করিয়া ডিম পাড়ে। এইরূপে প্রথম দুই মাস পর্য্যন্ত রাণী যে সব ডিম পাড়ে, তাহা হইতে কর্ম্মী মৌমাছির জন্ম হয়। তারপর চাকের প্রান্তস্থিত

অশ্রুঅক্ষিকা

৬৭

বড় বড় কুঠরীগুলিতে রাণী ডিম পাড়ে এবং ঐ সকল ডিম হইতে প্রায়ই স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছি জন্মে।

ডিম হইতে ২৩ দিনের মধ্যে শূককীট জন্মে। এই সময় কর্ম্মীরা ফুলের রেণুর সহিত মধু মিশাইয়া কাদার মত করিয়া ইহাদিগকে খাওয়ায়। শূককীট ৮১০ দিনের মধ্যে গুটিতে পরিণত হয়। তখন কর্ম্মীরা মোম দ্বারা কুঠরীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ১০১২ দিন পরে কুঠরীর ঢাকনি কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বাহির হয়।

কর্ম্ম-বিভাগ :

রাণী।—ডিম পাড়াই রাণীর প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া রাণী চাকের সর্ব্বপ্রকার কাজেরই তত্ত্বাবধান করে।

পুরুষ।—ইহারা অলস, বিশেষ কোন কাজ করে না, কেবল খায় আর নিদ্রা যায়।

কর্ম্মী।—মৌচাকে যে অসংখ্য মৌমাছি বিজ-বিজ করিতে দেখা যায়, উহাদের প্রায় সকলেই কর্ম্মী। কর্ম্মীরাই সংসারের যাবতীয় কাজ করে। কর্ম্মীরা মোম দ্বারা চাক প্রস্তুত করে। ইহারা গুঁড় দ্বারা ফুলের মধু চুষিয়া খায়। মধু হজম হইলে ইহাদের শরীর হইতে মোম বাহির হইয়া পেটের তলায় জমা হয়। ইহারা ঐ মোম দিয়া চাক প্রস্তুত করে।

মধু-আহরণকারী কর্ম্মীরা গুঁড় দ্বারা ফুল হইতে মধু চুষিয়া লইয়া পাকস্থলীর পাশের মধু সঞ্চয়ের থলিতে সঞ্চয় করিয়া

চাকে ফিরিয়া আসে এবং ইহার কতকটা মধু বাচ্চাদের খাওয়ায়, আর বাকিটা চাকের মধু সঞ্চয়ের খালি কুঠরীতে অসময়ের জন্য জমা রাখে।

কর্মীরা ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিবার সময় ফুলের রেণু ইহাদের গায়ের লোমে লাগিয়া যায়। তখন ইহারা পা দিয়া গায়ের ঐ সব রেণু একত্র জড় করে এবং উহার সহিত মুখের লাল। মিশাইয়া ছোট ছোট বড়ি তৈয়ার করিয়া, উহা পিছনের পায়ের রেণু রক্ষার চুপড়িতে জমা করে। এই বড়ি মধুর সহিত মিশাইয়া ইহারা বাচ্চাদিগকে খাওয়ায়।

কর্মীদের মধ্যে কাজের সুন্দর বাটোয়ারা থাকে ; এক এক দল এক এক কাজে নিযুক্ত হইয়া শূশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য নির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে একদল চাক প্রস্তুত করে, এক দল চাক পাহারা দেয়, এক দল মধু ও রেণু আহরণ করে, এক দল আবার বাচ্চাদের লালনপালন করে ও তাহাদের আহার করায়, ইত্যাদি। কর্মীরা যেমন চটপটে, তেমনই পরিশ্রমী। ইহারা সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকে।

চাকে অশান্তির সৃষ্টি :

চাক বাঁধার ২৩ মাসের মধ্যে চাকটি বেশ বড় হইয়া পড়ে। এসময় বহুসংখ্যক মৌমাছিতে চাকটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং চাকে প্রচুর মধু সঞ্চিত হয়। এই সময় চাকের প্রান্তভাগের বড় বড় কুঠরীগুলিতে রাণী যে সকল ডিম পাড়ে,

মধুমক্ষিকা

৬৯

তাহা হইতে প্রায়ই স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছি জন্মে। এক চাকে একাধিক রাণীর থাকিবার সুবিধা হয় না। সেজন্য চাকে রাণীদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন এক এক রাণী কয়েকটি পুরুষ এবং কয়েক হাজার কর্ম্মী লইয়া চাক ত্যাগ করিয়া অগ্ন্যত্র গিয়া ফুলের বনের নিকটে নূতন চাক তৈয়ার করে। পুরাতন চাকে নূতন রাণী নির্বাচিত হয়।

বুনো-মৌমাছি :

চাকের মৌমাছি ছাড়া আর এক প্রকার মৌমাছি আছে, ইহাদিগকে বুনো-মৌমাছি বলে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সমাজ বাঁধিয়া বাস করে না এবং চাকও তৈয়ার করে না। ইহাদের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও পুরুষ আছে, কর্ম্মী নাই! মৌমাছি-মাতা সুবিধামত স্থানে বা কাঠে গর্ত করিয়া তথায় ডিম পাড়ে এবং ডিমের উপর কয়েকটি মধুমাখা রেণুর বড়ি রাখিয়া বনে চলিয়া যায়। ডিম হইতে শূককীট জন্মিলে, উহারা ঐ বড়ি খাইয়া বর্দ্ধিত হইয়া গুটিতে পরিণত হয়। পরে সময় হইলে গুটি হইতে পূর্ণদেহ মৌমাছি বাহির হইয়া বনে চলিয়া যায় এবং ফুলের মধু ও রেণু খাইয়া বেড়ায়। ইহাদের অধিকাংশই শীতকাল উপস্থিত হইবার পূর্বে মরিয়া যায়।

আর একজাতীয় মৌমাছি অগ্নের চাকে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ডিমগুলি চাকের মৌমাছি দ্বারা লালিতপালিত হইয়া ক্রমে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হয়।

মশা

মশা ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও ইহারা যে আমাদের কত অনিষ্ট সাধন করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহারা যে শুধু মানুষের রক্ত পান করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে। ইহাদের দ্বারা মানব-শরীরে ম্যালেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, গোদ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

শ্রেণী-বিভাগ :

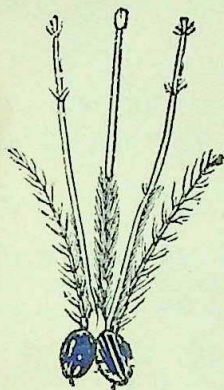
মশাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—
১। এনোফেলিস, ২। কিউলেক্স।

এনোফেলিস।—এই জাতীয় স্ত্রী-মশার দ্বারা এক ব্যক্তির শরীর হইতে অণুর শরীরে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমিত হয়।

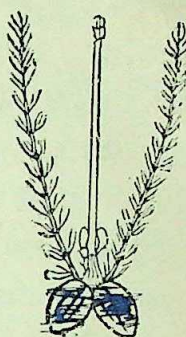
কিউলেক্স।—এনোফেলিস জাতীয় মশা ব্যতীত অগাণ্ড মশার সাধারণ নাম কিউলেক্স। ইহাদের দ্বারা ডেঙ্গু জ্বর, গোদ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য।—এনোফেলিস কিউলেক্স অপেক্ষা ছোট। এনোফেলিসের ডানায় কাল কাল দাগ আছে; কিউলেক্সের ডানায় দাগ নাই।

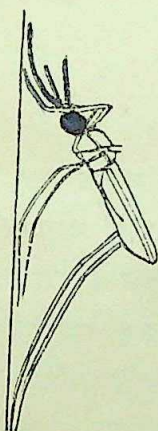
এনোফেলিসের শুঁড়ের দুই পাশে শুঁড়ের সমান লম্বা শুঁড়ের মত দুইটা জিনিস আছে; আর কিউলেক্সের ঐ দুইটা জিনিস অতীব ক্ষুদ্র।



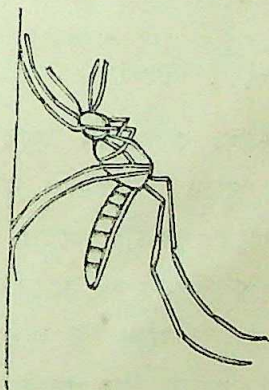
এনোফেলিসের মাথা ।



কিউলেস্তের মাথা ।



এনোফেলিস ।



কিউলেস্ত ।

এনোফেলিসের দেহ সোজা; আর কিউলেস্তের দেহ
কুজ। এনোফেলিস মাথাটি দেওয়ালে প্রায় ঠেকাইয়া

পিছন দিকটা উঁচু করিয়া বসে ; আর কিউলেক্স দেওয়ালের সহিত সমান্তরাল ভাবে বসে ।

এনোফেলিস দিবাভাগে বাহির হয় না । ইহারা সন্ধ্যাকালে আহারের সন্ধানে বাহির হয় । ইহাদের উড়িবার সময় কোন প্রকার শব্দ হয় না । কিউলেক্স দিনে ও রাত্ৰিতে সব সময়েই বাহির হয় । ইহাদের উড়িবার সময় বোঁ বোঁ শব্দ হয় এবং উহা ডানার শব্দ ।

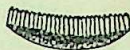
তোমরা উপরি-লিখিত মশার পার্থক্য মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিবে । তাহা হইলে, কোন্টা কোন্ জাতীয় মশা, তাহা চিনিতে পারিবে ।

জন্ম-বিবরণ :

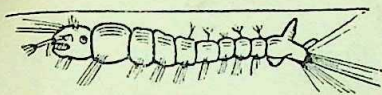
স্ত্রী-মশা গ্রীষ্মকালে জলে বিশেষতঃ আবদ্ধ পচা জলে প্রত্যেক বারে অনেকগুলি করিয়া ডিম্ব প্রসব করে । পরে ডিম্ব হইতে শূককীট জন্মে । ইহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় । শূককীটের পা থাকে না বটে, কিন্তু ইহারা সচল । ইহারা জলের ময়লা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী খাইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে । কয়েক দিন গুরুতর আহার করিয়া ও ২৩ বার খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা গুটিতে পরিণত হয় । এই গুটির আকৃতি কতকটা 'কমা'র মত । সময় হইলে গুটির আবরণ ভেদ করিয়া এক জোড়া পাতলা ডানা সমেত পূর্ণদেহ মশা



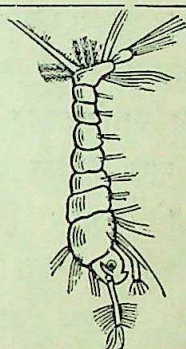
এনোফেলিসের ডিম্ব।



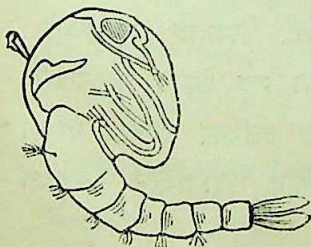
কিউলেস্কের ডিম্ব।



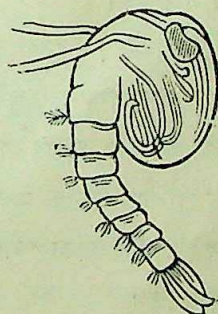
এনোফেলিসের শূককীট।



কিউলেস্কের শূককীট।



এনোফেলিসের গুটি।



কিউলেস্কের গুটি।

বাহির হইয়া কিছু সময় নিজের পরিত্যক্ত খোলসের উপর অবস্থান করে এবং শরীর শুকাইলে উড়িয়া যায়।

জন্মগত পার্থক্য।—এনোফেলিসের ডিম্ব বিচ্ছিন্ন ভাবে জলে ভাসে। কিন্তু কিউলেব্রের বহুসংখ্যক ডিম্ব আঠার মত এক প্রকার পদার্থ দ্বারা পরস্পর গ্রথিত হইয়া ভেলা বা নৌকার আকারে জলে ভাসে।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, এনোফেলিসের শূককীট জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরাল ভাবে জলে ভাসে। জলে নাড়া লাগিলে ইহারা জলের উপরকার অংশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু, কিউলেব্রের শূককীট লেজটিকে উপরদিকে এবং মাথা নিচু দিকে রাখিয়া জলের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে। কারণ, ইহাদের লেজের দিকের সরু ছিদ্র দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া চলে। জলে নাড়া লাগিলে ইহারা জলের তলায় চলিয়া যায়। গুটি অবস্থায় ইহাদের পার্থক্য সহজে ঠিক করা যায় না।

পরীক্ষা।—তোমরা আবদ্ধ পচা জলে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাকে ছুটাছুটি করিতে দেখ, উহারাই মশককীট। একটা কাচের গ্লাসে বা বোতলে জল সহ উহার কতকগুলি কীট পুরিয়া উহার মুখ কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া দাও। পরে তোমরা প্রত্যহ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, উহা হইতে কিরূপে মশা জন্মে।

মশা

৭৫

জীবন যাত্রা নির্বাহের নিবারণ

মশার জীবনের প্রায় ১৫ দিন জন্মেই কাটিয়া যায়। তারপর পূর্ণাঙ্গ মশা একাকী স্থলে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং যেখানে সেখানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করে। ইহারা প্রায়ই জন্মস্থান হইতে আধ মাইলের বেশি দূরে যায় না।

পুরুষ-মশা রক্তও পান করে না এবং বেশি দিন বাঁচেও না। ইহারা ফুল ও ঘাস পাতার রস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু, স্ত্রী-মশা মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহারা এক মিনিট কাল রক্ত পান করিতে পারিলে, ইহাদের উদর পূর্ণ হয় এবং সেই ভুক্ত রক্ত পরিপাক প্রাপ্ত হইতে চারি দিন পর্যন্ত সময়ও লাগে। রক্ত পান করিলে যেমন ইহাদের শরীর পুষ্ট হয়, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরকার ডিমগুলিরও পুষ্টি সাধিত হয়।

এনোফেলিস মশা সূর্যের আলো ও উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। সেজন্য ইহারা সন্ধ্যাকালে খাচ্চ অন্ধবেগে বাহির হয়। অতএব, সন্ধ্যার পর কাপড়চোপড় দিয়া সর্বশরীর ঢাকিয়া রাখিলে এবং রাত্রিকালে মশারি খাটাইয়া শুইলে এই জাতীয় মশায় কামড়াইতে পারে না।

মশক-কুলের বিনাশ সাধন

মশক-কুলের বিনাশ সাধন করিতে হইলে, মশার জন্ম নিবারণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ যে সমস্ত স্থানের আবদ্ধ পচা জলে মশা জন্মে, সেই সমস্ত স্থানের জলে ৫১৭ দিন অন্তর কিছু কিছু কেরোসিন ছড়াইয়া দিতে হইবে। জলের উপরিভাগে কেরোসিনের একটা আবরণ পড়ে। তাহাতে শূককীটগুলি নিশ্বাস লইতে না পারিয়া দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে।

পানীয় জলের জলাশয়ে কই, খলসে প্রভৃতি মাছ ছাড়াইয়া দিলে উহারা শূককীট খাইয়া ফেলিবে। এই সব জলাশয়ের জলের মধ্যে বনজঙ্গল থাকিতে দিবে না, যাহাতে শূককীটগুলি তাহার মধ্যে পলাইয়া বাঁচিতে না পারে।

বাড়ির চারি পাশের বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিবে—যাহাতে মশা পলাইয়া থাকিবার স্থান না পায়।

ডোবা, গর্ত প্রভৃতি ভরাট করিয়া ফেলিবে এবং পরিত্যক্ত হাড়ি কলসি প্রভৃতি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে—যাহাতে যেখানে সেখানে জল জমিয়া পচিতে না পারে। যে সমস্ত নদী, খাল ও পুষ্করিণী মজিয়া গিয়াছে, সেগুলির সংস্কার সাধন করিতে হইবে। মোটের উপর, মশা যাহাতে লুকাইয়া থাকিবার ও ডিম পাড়িবার সুবিধা না পায়, সর্বত্র তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, কিছুদিন মধ্যে দেখিবে, মশক-কুলু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মশার দ্বারা উৎপন্ন রোগসমূহও দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

মাকড়সা

অক্ষ-প্রত্যক্ষ :

মাকড়সা, পিপীলিকা, মৌমাছি, মশা, প্রজাপতি প্রভৃতি একই শ্রেণীর পোকা। কিন্তু পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতির তুলনায় মাকড়সার শারীরিক গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মাকড়সার শরীরে দুইটি ভাগ আছে—এক ভাগে মাথা ও বুক একসঙ্গে জোড়া, অপর ভাগে পেট। ইহাদের মাথার উপরে পৃথক্ পৃথক্ আঁটটি চোখ এরূপভাবে বসান যে, ইহারা সব দিকেই দেখিতে পায়। ইহাদের মুখে এক জোড়া শক্ত চোয়াল আছে। ইহাদের সম্মুখ ভাগে চারি জোড়া পা আছে এবং প্রত্যেক পায়ে সাতটি করিয়া গাঁট আছে। সেজন্য ইহারা সামনে ও পিছনে সহজে চলাফেরা করিতে পারে। ইহাদের পায়ে ধারাল নখ আছে। মাকড়সার পিছনের পা চিরুনির মত কাঁটায়ুক্ত। ইহাদের পেটের নিচে সূতা প্রস্তুতের যন্ত্র আছে। মাকড়সার পাখা নাই। পিপীলিকা প্রভৃতির মত ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে না।

জন্ম-বিসরণ :

তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, স্ত্রী-মাকড়সা অনেক সময় বৃকের নিচে একটি ছোট চেষ্টা কোঁটার মত জিনিস

ছোটদের বিজ্ঞান

লইয়া চলাফেরা করে। উহাই মাকড়সার ডিম রক্ষার
আধার। স্ত্রী-মাকড়সা শরীর হইতে সূতা বাহির করিয়া
তদ্বারা ঐ আধার তৈয়ার করিয়া তন্মধ্যে বহুসংখ্যক ডিম
পাড়ে। তিন চারি মাস পরে ঐ সকল ডিম ফুটিয়া পূর্ণদেহ
বহু শিশু-মাকড়সা আধার ভেদ করিয়া বাহির হয়। স্ত্রী
অপেক্ষা পুরুষ মাকড়সা অনেক ছোট। ইহারা বিশেষ কোন
কাজ করে না এবং স্ত্রীর প্রদত্ত খাবার খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

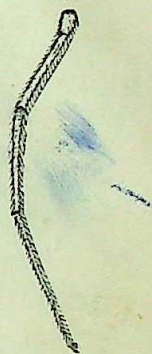
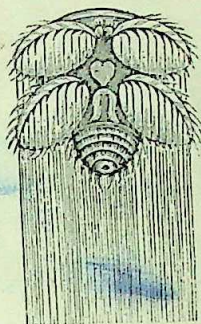
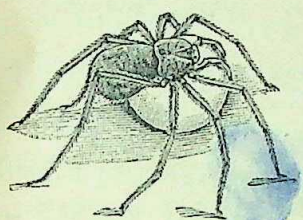
জাল-প্রস্তুত প্রণালী :

নানা জাতীয় মাকড়সা আছে। ইহাদের জাল বুনিবার
কৌশলও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। মাকড়সার পেটের নিচের
দিকে কয়েকটি কাল দাগ দেখা যায়—ঐগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র ব্যতীত
আর কিছুই নহে। ঐগুলির আশেপাশে আবার বহুসংখ্যক
সূক্ষ্মতর ছিদ্র আছে। জাল বুনিবার সময় ঐ সকল ছিদ্র
হইতে এক রকম আঠাল রস বাহির হইয়া বাতাসে
শুকাইলে উহা বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত হয়।
পিছনের পায়ের সাহায্যে এইরূপ অনেকগুলি সূতা একত্র
করিয়া জাল বুনিবার উপযুক্ত মোটা সূতা হয় এবং ঐ
মোটা সূতা দ্বারাই মাকড়সা জাল বুনিয়া থাকে।
মাকড়সারা সূতা ইচ্ছামত সরু বা মোটা করিতে পারে।
মাকড়সা এক স্থানে বসিয়া প্রথমে কতকটা সূতা বাতাসে
ছাড়িয়া দেয় এবং ঐ সূতা উড়িয়া গিয়া কোনও জিনিসে

মাকড়সা

৭৯

আটকাইয়া যায়। তখন ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া
মাকড়সা আরও কয়েকস্থানে সূতা আটকাইয়া দেয় এবং



মাকড়সা—বুকের নিচে ডিম
রক্ষার আধার।

সূতা প্রস্তুতের যন্ত্র। পা।

এই সব সূতার উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সুন্দর জাল বুনিয়া
ফেলে। এই জাল দৃঢ় করিবার জন্য ইহারা রীতিমত 'টানা
ও পড়েন' দিয়া থাকে। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে,
ইহাদের জাল কিরূপ কৌশলে প্রস্তুত।

শূতে যাতায়াতের উপায়।

মাকড়সা শূতে চলাফেরা করিতে পারে। ইহারা কিছু সূতা
একত্র জড়াইয়া তাহার উপর বসিয়া বাতাসের সাহায্যে এক স্থান
হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। কোন কোন মাকড়সা নদীর
এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত জাল বুনিয়া থাকে।

খাদ্য-সংগ্রহ :

মাকড়সা শিকারী জীব। ইহারা জাল পাতিয়া জীবন্ত মশা, মাছি, ফড়িং ইত্যাদি ধরিয়া খায়। ইহারা জাল পাতিয়া তাহার মাঝখানে বা জাল হইতে কিছু দূরে জালের একটি সূতা পায়ে লাগাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মশা, মাছি ইত্যাদি উড়িতে উড়িতে গিয়া জালের সূতার আঠায় আটকাইয়া গেলে, মাকড়সার পায়ের সূতাটি নড়িয়া উঠে। তখন মাকড়সা ছুটিয়া গিয়া শিকারটিকে দৃঢ়ভাবে সূতা দিয়া জড়াইয়া ফেলে এবং কামড়াইয়া বধ করে। বড় বড় মাকড়সারা জাল পাতিয়া ছোট ছোট পাখী, টিকটিকি, ইছুর প্রভৃতিও শিকার করে।

মাকড়সারা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করিয়া রাখে। ইহারা জাল পাতিয়া পোকা ধরিয়া উহাকে সূতা দ্বারা জড়াইয়া জীবন্ত অবস্থায় বাসায় রাখিয়া দেয়। পরে আবশ্যক মত ইহারা এই সব পোকা খাইয়া থাকে।

বিষ :

মাকড়সার মুখে বিষ আছে। সেজন্য ইহাদের কামড়ে জ্বালা করে। শরীরের কোন স্থান চাটিলে ঐ বিষ লাগিয়া যন্ত্রণা হয় এবং কখন কখন ক্ষতও হয়।

চড়ুই

চড়ুই পাখী মাহুঘের আশেপাশে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা গৃহস্থের বাড়িতে ঘরের মধ্যে সর্বদা খাতায়ত করে। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল; তবে একক্ৰমে বেশিক্ষণ উড়িতে পারে না।

পুরুষ-চড়ুই স্ত্রী-চড়ুই অপেক্ষা আকারে কিছু বড়। পুরুষ চড়ুইএর গায়ের রং ঘোর বাদামী এবং গলার নিচে কাল দাগ থাকে; আর স্ত্রী-চড়ুইএর গায়ের রঙ ফিকে বাদামী। ইহারা এক এক জোড়া একসঙ্গে থাকে। কিন্তু, যখন ইহাদের অনেকগুলি একসঙ্গে কোথাও জড় হয়, তখন ইহাদের কিচিরমিচির ডাকে লোক বিরক্ত হইয়া উঠে।

বাসা :

স্ত্রী ও পুরুষ চড়ুই উভয়ে মিলিয়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে ঘরের চালের ফাঁকে বা কড়ি বরগার ফাঁকে খড়্‌ কুটা দিয়া বাসা বাঁধে। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস মধ্যে স্ত্রী-চড়ুই এক সময়ে তিনটি হইতে পাঁচটি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। তারপর স্ত্রী-চড়ুই ডিমে 'তা' দেয় এবং পুরুষ-চড়ুই খাবার আনিয়া তাহাকে খাওয়ায়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হইলে উভয়েই তাহাদের লালনপালন করে এবং ঠোঁটে করিয়া খাবার আনিয়া বাচ্চাদের খাওয়ায়। কিন্তু, একজন খাবার আনিতে বাহিরে

গেলে, অত্জন বাসায় থাকিয়া বাচ্চাদের পাহারা দেয়। ইহারা আবার সময় সময় পরস্পর এমন বাগড়া করে যে, বাসা সমেত ডিম বাচ্চা মাটিতে পড়িয়া যায়।

শ্রাদ্ধ্য : শোভে

কীট-পতঙ্গ, সর্বপ্রকার শস্ত্র, ছোট ছোট চারাগাছ এবং মানুষের সর্বপ্রকার খাড়াই ইহারা খায়। এক কথায় ইহারা সর্বভুক্। তবে, ইহারা যেমন কীট-পতঙ্গ খাইয়া ক্ষেতের ফসল রক্ষা করিয়া মানুষের উপকার করে, সেইরূপ আবার ছোট ছোট চারাগাছ এবং সত্ত-বোনা বীজ খুঁটিয়া খাইয়া মানুষের যথেষ্ট অপকারও করে। অনেক সময় বুনো-চড়াই দলে দলে আসিয়া ক্ষেতের বীজ, ধান ইত্যাদি খাইয়া মানুষের অনিষ্ট করে। কখন কখন ঘরের চড়াইও ইহাদের দলে যোগ দেয়। চড়াইএর ঠোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ খুঁটিয়া তুলিবার পক্ষে খুব উপযোগী।

জ্ঞান :

তোমরা চড়াইএর জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। ইহারা জ্ঞান করিতে ভালবাসে। ইহারা অল্প জলে বার বার ডানা ছড়াইয়া ডানার নিচের পালক পর্যন্ত ডুবাইয়া জ্ঞান করে। ইহারা আবার অনেক সময় ছাই বা ধূলার মধ্যে গড়াগড়িও দেয়।

কাক

কাক অত্যন্ত চতুর ও সাহসী পান্থী। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গৃহস্থের বাড়ির উঠানে, রোয়াকে, ঘরের চালের উপরে, নিকটবর্তী গাছে ইহাদের আমদানী হয়। ইহাদের স্বর কৰ্কশ। কাকের ঠোঁট কাল এবং শক্ত। ইহাদের পা দুইখানি এবং প্রত্যেক পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল আছে। ইহারা ডানার সাহায্যে বহু উচ্চে উড়িতে পারে।

শ্রেণী-বিভাগ :

আমরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর কাক দেখিতে পাই :—

১। পাতিকাক, ২। দাঁড়কাক, ৩। ভূষণ্ডীকাক।

পাতিকাক।—আকারে ছোট। ইহাদের গায়ের রঙ কাল হইলেও, ইহাদের গলা ও পেটের দিকটা ধূসর রঙের। ইহাদের স্বর তত গম্ভীর নহে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়।

দাঁড়কাক।—আকারে কিছু বড়। ইহাদের গায়ের রঙ কাল। ইহাদের স্বর গম্ভীর। ইহারা এক এক জোড়া একনঙ্গে বাস করে।

ভূষণ্ডীকাক।—ইহারা দাঁড়কাক অপেক্ষা বড়। ইহাদের সংখ্যা খুব কম। ইহারা মরা পচা জীবজন্তু খায়। কখন কখন মাঠে শকুনির সহিত ইহাদিগকে দেখা যায়।

বাসা :

স্ত্রী ও পুরুষ কাক উভয়ে মিলিয়া ফাল্গুন মাস হইতে শুক্লা ছোট ছোট ডাল, খড়্ কুটা দিয়া বড় বড় গাছের উঁচু ডালে বাসা বাঁধে। বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস মধ্যে স্ত্রী-কাক এক সময়ে ঈষৎ নীল বর্ণের তিনটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। তারপর স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল ডিমে 'তা' দেয়। বাচ্চা বড় হইলে ইহারা বাসা ত্যাগ করিয়া যায়।

বাসস্থান :

বহু কাক একসঙ্গে বড় অশ্বখ বা অন্য গাছে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করে এবং দিবাভাগে যেখানে সেখানে বিশেষতঃ গৃহস্থের বাড়িতে আসিয়া খাবার সংগ্রহ করিয়া খায়।

খাদ্য :

কাককে সর্বভুক্ প্রাণী বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহারা ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, পাকা ফল, মিঠাই প্রভৃতি মানুষের সর্বপ্রকার খাওয়াই খায়। অধিকন্তু জীবজন্তুর পচা মাংস, কীট-পতঙ্গ, কাশি, কফ প্রভৃতি ইহারা কিছুই বাদ দেয় না।

জ্ঞান :

কি শীত কি গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই কাক জ্ঞান করিতে বড় ভালবাসে। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, ইহারা জলে সর্ব শরীর ও ডানা ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া কেমন সুন্দর জ্ঞান করে।

স্বজাতি-প্রীতি :

কাকের স্বজাতি-প্রীতি বড় আশ্চর্য্য। একটি কাককে তাড়া করিলে, সে 'কা কা' রবে অগ্ন্যাগ্ন কাককে ডাকিয়া আনে। আবার একটি কাক বিপদে পড়িলে বা ধরা পড়িলে অগ্ন্যাগ্ন কাকেরা দলে দলে আসিয়া 'কা কা' রবে চীৎকার করিয়া তাহাকে সহানুভূতি জানায়। বিশেষতঃ পাতিকাকের মধ্যে এইরূপ স্বজাতি-প্রীতি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বভাব :

কাক প্রত্যহ প্রত্যুষে দলে দলে বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া 'কা কা' শব্দে ডাকিতে ডাকিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দিকে চলিয়া যায়। এইরূপে ইহারা যেন প্রত্যুষে ডাকিয়া আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া দেয়। ইহারা আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'কা কা' শব্দে ডাকিতে ডাকিতে নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া যায়।

কাক অত্যন্ত চতুর ও চঞ্চল। ইহারা গৃহস্থের বাড়িতে আসিয়া সর্বদাই কেবল খাবার সন্ধান করে এবং সুবিধা পাইলেই খাবার লইয়া উড়িয়া যায়। ইহারা এত বুদ্ধিমান এবং সতর্ক যে, সহসা কোন বিপদেও পড়ে না। ইহারা সুবিধা পাইলেই বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের হাত হইতেও খাবার লইয়া পলাইয়া যায়। দাঁড়কাক মানুষকে ভয় করে ও দূরে দূরে থাকিয়া খাবার সন্ধান করিয়া বেড়ায়। কাক আমাদের পরিত্যক্ত খাবার জিনিস ও ক্ষেত্রের কীট-পতঙ্গ খাইয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করে।

বেঙ

শ্রেণী-বিভাগ :

আমাদের দেশে সচরাচর দুই প্রকার বেঙ দেখিতে পাওয়া যায়,—১। সোনা বেঙ, ২। কুনো বেঙ।

সোনা বেঙ জলে বাস করে। ইহারা দেখিতে বেশ বড় হয়। ইহাদের গায়ে সোনালী দাগ দেওয়া থাকে। সোনা বেঙের উপরের পাটিতে দাঁত আছে। আর কুনো বেঙের গায়ে আঁচিলের মত গুটি থাকে। ইহাদের দাঁত নাই।

জন্ম-বিবরণ :

বেঙের জন্ম-বৃত্তান্ত বড়ই বিচিত্র। এক্ষণে আমরা দেখিব, ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ বেঙ হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের চেহারার কতবার কি ভাবে পরিবর্তন হয়।

ডিম্ব।—স্ত্রী-বেঙ বর্ষাকালে সাধারণতঃ জলে একসঙ্গে অনেক ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব প্রসব করিবার পরে ইহারা আর সম্মানদিগের কোন যত্ন লয় না। প্রথম অবস্থায় ডিমগুলি ঘুণের গুঁড়া অপেক্ষাও ছোট থাকে।

বর্ষাকালে পুকুরে ও পগারে জেলীর মত বা গাঁদের আঠার মত জমাট পিচ্ছিল চাপ চাপ যাহা দেখা যায়, উহারই ভিতর যে সব কাল কাল দানা থাকে—সেইগুলিই সোনা বেঙের

ডিম। আর নরম পিচ্ছিল আঠার মত জিনিসটা ডিমের খোলস; উহাই ডিমকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে।

কুনো বেঙের ডিম মটর মালার ছড়ার আকারে আঠায় গ্রথিত হইয়া জলে ভাসে। ইহার প্রত্যেক দানার মধ্যে একটি করিয়া ডিম থাকে।

বেঙের ডিম জলে থাকিয়া ক্রমশঃ মটরের মত বড় হয়।

বেঙাচি :

প্রথম অবস্থা।—ডিম ফুটিবার সময় ডিমের উপর কাল বিন্দুর মত দেখা যায়। ঐ বিন্দুর পাশ দিয়া ক্রমে ক্ষুদ্র লেজ বাহির হয়। ডিম পাড়িবার প্রায় ১৫ দিন পরে ইহারা খোলস হইতে বাহির হইয়া জলে পড়ে। এ অবস্থায় ইহাদের গোল মাথা ও লেজ ব্যতীত আর কোন অঙ্গই উৎপন্ন হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা।—বেঙাচি জলে পড়িবার পরে, যেখানে মুখ হইবে তাহার দুই পাশে দুইটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বাহির হয় এবং উহার দ্বারা ইহারা জলের শেওলা বা অণু কোন জিনিসে আটকাইয়া বুলিতে থাকে।

তৃতীয় অবস্থা।—উপর্যুক্ত অবস্থায় ২৩ দিন কাটিয়া যায়। তাহার পর মুখের ছিদ্র দেখা দেয় এবং উহার চতুর্দিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতের মত উদগত হয়। এই অবস্থায় ইহারা খুব চঞ্চল থাকে এবং জলের মধ্যে লেজের সাহায্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এ সময় ইহারা মরা প্রাণীর মাংসের রস,

ছোঁচদের বিজ্ঞান

জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং খাতের কণা খাইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে ইহাদের দ্বারা জলাশয়ের জলও পরিশুদ্ধ হয়।



ভিম। খোলনের মধ্যে
বেঙাচি।

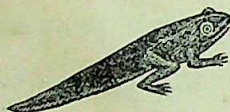
বেঙাচি ঝুলিয়া আছে। বেঙাচি—
ফুলকোযুক্ত।



বেঙাচি—ফুলকো
ঢাকা।

বেঙাচি—পিছনের
পায়ের আরম্ভ।

বেঙাচি—পিছনের পা।



বেঙাচি—চারি পা।

লেজ প্রায় লুপ্ত।

বেঙ।

চতুর্থ অবস্থা।—ইহার পরে ক্রমে ইহাদের মুখের ছিদ্রের দুই পাশে ফুলকো দেখা দেয়।

পঞ্চম অবস্থা।—ফুলকো দেখা দিবার কিছুদিন পরে বেঙাচির ফুলকোর উপর কানকোর সৃষ্টি হয় এবং ইহার দ্বারা

ফুলকো ঢাকা পড়িয়া যায়। এই সময় ফুলকো দ্বারাই শ্বাস-ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং গলনলী, পাকস্থলী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ষষ্ঠ অবস্থা।—দেড় মাস বা দুই মাসের সময় বেঙাটির দেহ ও লেজের সংযোগস্থলে দুই পাশে দুইটি গুটির মত দেখা দেয় এবং ইহাই পিছনের পায়ের প্রথম চিহ্ন।

সপ্তম অবস্থা।—পিছনের পা বাহির হওয়ার ৮১০ দিন পরে ইহাদের সম্মুখের পা বাহিরে দেখা দেয়। ইহার পর বেঙাটির দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেজটি ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে অবশেষে শরীরের সঙ্গে একেবারে মিলাইয়া যায়। এই সময় ফুলকো লুপ্ত হইয়া তাহার স্থলে ফুসফুসের উৎপত্তি হয় এবং তখন বেঙ বাতাস হইতে শ্বাস গ্রহণ করে।

এইরূপে ডিম হইতে বেঙাটি এবং বেঙাটি হইতে ক্রমশঃ বেঙের সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্তি ঘটে। তখন সে জল ত্যাগ করিয়া স্থলে উঠিয়া কীট-পতঙ্গ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করে।

পরীক্ষা।—তোমরা পুকুরের জলে মাছের পোনার মত বাহা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখ, উহারাই বেঙাটি। উহার কতকগুলি বেঙাটি ধরিয়া একটি মুখ-খোলা বোতলের জলে রাখিয়া দিন দিন উহাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে, উহা হইতে কি ভাবে বেঙ জন্মে।

জীবন যাত্রা নির্বাহের বিবরণ :

বেঙ উভচর প্রাণী। ইহাদের পা চারিখানা এবং পিছনের পা সম্মুখের পা অপেক্ষা বড়। সেজন্ত ইহারা জোরে লাফাইতে পারে। ইহাদের সম্মুখের পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল আছে। ইহাদের পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙুলই পাতলা চামড়া দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সেজন্ত ইহারা বেশ সাতার দিতেও পারে।

বেঙের জিহ্বা বড় অদ্ভুত রকমের। বেঙের জিহ্বার গোড়াটি মুখের ভিতর নিচের ঠোঁটের সহিত সংলগ্ন এবং ইহার অগ্রভাগটা থাকে গলার ভিতর দিকে। কাজেই, বেঙ জিহ্বা উন্টাইয়া বাহির করিয়া শিকার ধরে এবং শিকারটি জিহ্বার লালায় আটকাইয়া যায়। তারপর সে উহা গিলিয়া ফেলে। বেঙ খাচ্চ চৰ্চণ করে না, গিলিয়াই খায়। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গই বেঙের প্রধান খাদ্য। ইহারা সন্ধ্যার সময় শিকারে বাহির হয়।

বেঙ মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া শ্বাস লয় ও গলা ফুলাইয়া সেই বাতাস রাখে; পরে গলার ফুলা সঙ্কুচিত করায় বাতাস ফুসফুসে যায়। আবার গলা ফুলাইয়া বেঙ ফুসফুসের বাতাস মুখের মধ্যে আনে ও মুখ খুলিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করে। শ্বাস-ক্রিয়া চালাইবার জন্তই বেঙ এইরূপে বার বার গলা

ফুলায় ও মুখ বন্ধ করে। শব্দ করিবার সময়ও ইহারা মুখ বন্ধ রাখে।

বর্ষাকালে জল পাইয়া বেঙ সর্বাপেক্ষা স্ফুর্তিযুক্ত হয়। বৃষ্টির পরে ইহারা একসঙ্গে শুর ধরিয়া গান করে। কিন্তু শীতকালে ইহারা গর্ভের মধ্যে, দেওয়ালের কাঁকে, খড়ের গাদার মধ্যে না খাইয়া মরার মত নিস্তেজভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে ও শীর্ণ হইয়া যায়। পরে শীতকাল কাটিয়া গেলে ইহারা বাহিরে আসিয়া জল পাইয়া ও প্রচুর আহাৰ করিয়া পুনরায় রীতিমত হুগুগু হয়। বেঙ কীট-পতঙ্গ খাইয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করে।

প্রজাপতি

শ্রেণী-বিভাগ :

নানা রকমের প্রজাপতি দেখা যায়। প্রজাপতির ডানায় আইসের মত নানা রঙের চূর্ণ পদার্থ লাগান থাকে। সেজন্য ইহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়। প্রজাপতিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—১। প্রজাপতি, ২। রাত-প্রজাপতি।

প্রজাপতি।—ইহারা দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়ায়। বসিয়া থাকিলে ইহাদের ডানা পিঠের উপর খাড়া হইয়া থাকে। ইহাদের ডানা দেখিতে বড় সুন্দর।

রাত-প্রজাপতি।—ইহারা রাত্রিতেই বাহির হয় এবং দিনের বেলায় যেখানে সেখানে লুকাইয়া থাকে। বসিয়া থাকিলে ইহাদের ডানা পিঠের উপর পড়িয়া থাকে। রাত-প্রজাপতির ডানা তত সুন্দর নহে। রাত্রিতে আলোর নিকট ইহাদিগকে দেখা যায়।

জন্ম-বিবরণ :

প্রজাপতির জীবনের চারিটি অবস্থা দৃষ্ট হয় :—

১। প্রথম অবস্থা—ডিম্ব।

২। দ্বিতীয় অবস্থা—শূককীট।

প্রজাপতি

৯৩.

৩। তৃতীয় অবস্থা—গুটি।

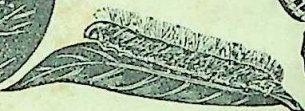
৪। চতুর্থ অবস্থা—প্রজাপতি।

প্রথম অবস্থা—ডিম :

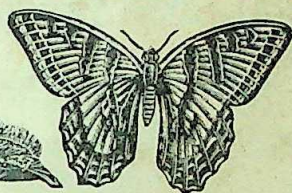
স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের পাতায় একবারে ছোট ছোট সরিসার মত অনেক সাদা ডিম পাড়ে। ইহারা সন্তানদের লালনপালন করে না।



ডিম।



শুককীট।



প্রজাপতি।

দ্বিতীয় অবস্থা—শুককীট :

ডিম হইতে সময়মত শুককীট বাহির হইয়া প্রথমেই ডিমের খোসাটা খাইয়া ফেলে। তৎপর ইহারা গাছের সবুজ পাতা খাইয়া বড় হইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত বেশি থাকে এবং প্রচুর আহার করে।

তৃতীয় অবস্থা—গুটি :

কিছুদিন প্রচুর আহার করিবার পরে ক্রমশঃ শুককীটের আহার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন ইহাদের শরীর

একটা পাতলা আবরণে আবৃত হইয়া ক্রমে ইহা গুটিতে পরিণত হয়।

চতুর্থ অবস্থা—প্রজাপতি :

গুটিতে পরিণত হইলে পর ঐ আবরণের মধ্যে ইহাদের দেহের আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটে। সময় হইলে গুটি কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ সুন্দর প্রজাপতি বাহির হইয়া উড়িয়া যায়।

জীবনযাত্রা নির্বাহের বিবরণ :

প্রজাপতি চারিখানা সুন্দর ডানার সাহায্যে উড়িয়া উড়িয়া ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়ায়। তাহার ফলে, ফুলের বীজকোষে বীজ উৎপন্ন হইবার সাহায্য হয়। ইহারা ফলের রসও খায়। প্রজাপতির গুঁড় স্ত্রীণ্ডের মত। মধু খাইবার সময় ইহারা গুঁড়টিকে লম্বা করিয়া মধুভাণ্ডে ঢুকাইয়া দেয়। ইহাদের সমাজ-বন্ধন নাই এবং নির্দিষ্ট বাসস্থানও থাকে না ; ইহারা দরকার হইলেই যেখানে সেখানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করে ও সময় কাটায়।

প্রজাপতি বড় স্বল্পায়ু। ইহাদের পুরুষেরা ২১ দিনের বেশি বাঁচে না ; আর স্ত্রীরা ডিম পাড়িয়াই মারা যায়।

প্রজাপতির চাম :

রেশম বা তসরের জন্ত লোকে প্রজাপতি পুখিয়া থাকে। রেশম-প্রজাপতির শূককীটের মুখের লাল হইতে রেশম

প্রজাপতি

৯৫

সূতা প্রস্তুত হয়; তদ্বারা শূককীট নিজের শরীরের চতুর্দিকে যে আবরণের সৃষ্টি করে, উহাই রেশমের গুটি। শূককীটের দেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে লোকে উহাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত বাঁপি বা চুপড়িতে রাখিয়া দেয়। সেখানে ইহারা ছোট ছোট আমড়ার আকৃতির গুটি বাঁধে। আবার গাছের



রেশম-প্রজাপতির শূককীট।

পাতায় বা ডালেও ইহারা ঐরূপ গুটি বাঁধে। এই গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে-সূতা নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য প্রজাপতি গুটি কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বেই লোকে গরম জলে ঐ গুটি ডুবাইয়া পোকাটিকে মারিয়া ফেলে এবং পরে ঐ গুটি হইতে কৌশলে যন্ত্রের সাহায্যে রেশম সূতা খুলিয়া লয় ও উহা দ্বারা রেশমী কাপড় প্রস্তুত করে। এই জাতীয় প্রজাপতির শূককীট তুঁত গাছের পাতা খাইয়া রেশমের গুটি বাঁধে।

অন্য এক জাতীয় প্রজাপতির শূককীট শাল, কুল প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া উপরি-উক্ত প্রকারে তসরের গুটি বাঁধে। ঐ গুটি হইতে সূতা খুলিয়া লইয়া উহা দ্বারাও লোকে কাপড় তৈয়ার করে।

सप्तमः

सप्तमः

३

PAID & PROCESSED 18-7-91
Vide Bill No 442
Anis Book Binder

